হিন্দু শক্তির উত্থানে স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীরা বিষোদ্গার করে চলেছেন — পৃঃ ১২

স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি হওয়া কেন এত জরুরি — পৃঃ ২৭

৬৯ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা।। ২৪ এপ্রিল ২০১৭।। ১০ বৈশাখ - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

রামের বজ্রনির্ঘোষ

রামনবমী কি শুধু বিজেপির, প্রশ্ন মমতার

সশস্ত্র মহিলাদের মিছিলে চমকিত শিল্পনগরী

তিনি ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায়। কিন্তু দেশের একটি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হয়েও তাঁর বক্তব্য ঘিরে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। বুধবার রামনবমী উপলক্ষে দুর্গাপুরে তাঁর মন্তব্যের সমালোচনায় সরব হয়েছে বাম ও তৃণমূল।

অস্ত্র হাতে মহিলাদের মিছিলে দোষ দেখছেন না ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথা এ রাজ্যের প্রাক্তন বিজেপি নেতা তথাগত রায়। তিনি বলেন, 'মহিলারা যখন আক্রান্ত হন

রামনবমীতে রাজ্যে সশস্ত্র মিছিল করল গেরুয়া বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: গত বিধানসভা নির্বাচনে ১৭ শতাংশ ভোট পেয়ে পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের জোরালো উপস্থিতির আভাস দিয়েছিল বিজেপি। এবার সেই শক্তি আরও বাড়াতে বঙ্গে 'রাম'কেই হাতিয়ার করতে চাইছে গেরুয়া শিবির। বৃহস্পতিবার রামনবমী উপলক্ষে রাজ্যের বহু জায়গায় সশস্ত্র মিছিল করে তারা যেভাবে শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করল, তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। অবশ্য রাজ্য বিজেপি নেতাদের বক্তব্য, রামনবমীর সঙ্গে দলের সরাসরি কোনও

Sword-wielding marchers power saffron shows of strength, Mamata

Roar in the name of Ram

OUR BUREAU

April 5: Bengal today gaped at the unfamiliar sight of sword-brandishing, saffron-clad men, women and children marching down the streets to celebrate Ram Navami, prompting chief minister Mamata Banerjee to warn against the appropriation of religious festivals and symbols.

The RSS claimed "peaceful" participation of at least six lakh people in 200 processions — a display of might without saffron precedent in the state.

From processions with swords, spears and bows and arrows to bike rallies festooned with saffron flags, the shows of strength ruled the roads in numerous pockets of Birbhum, Burdwan, Nadia, East and West Midnapore, Darjeeling and Malda.

In Calcutta, the Sangh parivar outfits took out 22 rallies. Slogans of *Jai Shri Ram* and *Har Har Mahadev* rent the air as the processions wound their way through Bhowanipore, Dunlop, Garia, Kidderpore and New Town

Supporters of the Ram Navami Udjapon Samiti take out a procession carrying weapons in Birbhum. (Dwijodas Ghosh)

সিপিএম থেকে মমতা গভীর শিক্ষা নিয়েছেন। তাই লক্ষ করবেন, সিপিএম মার্কসবাদ বা সমাজতন্ত্রকে মহান প্রতিপন্ন করার জন্য রবীন্দ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দ সকলকেই হেয় করেছে। নেতাজিকে অপমান করেছে।

বিজেপিকে এখন থেকেই উত্তর ভারতীয় গোবলয়ের রাজ্য বাংলায় নিয়ে এলে প্রবল সমর্থনের একটা ঝড় পাওয়া... যদি কোনও স্থানীয় ক্যারিশমা প্রদর্শক না হতে পারেন। বাইরে থেকে আমদানি করা ভারতের।

নব রামায়ণ

দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে মামলা, য় অভিযোগ উদ্যোক্তাদের নামে

রামনামে উত্তাল পশ্চিমবঙ্গ

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা, ১০ বৈশাখ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

২৪ এপ্রিল - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

সূর্য নমস্কার ও নমাজ ▯ দেবাশিস আইয়ার ▯ ১০

খোলা চিঠি : বাংলাকে উত্তরপ্রদেশ বানাবেন দিদি নিজেই, দিলীপ ঘোষ কম খাটুন ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

হিন্দুশক্তির উত্থানে স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীরা বিষোদ্গার করে চলেছেন ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১২

হিন্দুত্বের অশ্বমেধ ঘোড়ায় সওয়ার মিশন নিউ ইণ্ডিয়া ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১৪

শেয়ার বাজারের কর্মসূচি ▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ১৬

কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে গো-মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজন ▯ কৃষ্ণেন্দু ব্যানার্জী ▯ ১৭

রামনবমী : পশ্চিমবঙ্গে নিঃশব্দ বিপ্লব ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১৯

হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রায় লাঠি বোমা ▯ ২২

অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি হওয়া কেন এত জরুরি ▯ চেতন ভগত ▯ ২৭

তত্ত্বকে ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠার রূপকার ▯ রাকেশ দাস ▯ ৩১

হিন্দু মুনি-ঋষিদের পরিচয় ▯ রবীন সেনগুপ্ত ▯ ৩৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ২৯-৩০ ▯ অঙ্গনা : ৩৪ ▯ সুস্বাস্থ্য: ৩৫ ▯ খেলা : ৩৭ ▯ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯ সমাবেশ সমাচার : ৪০-৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতীয় পরমাণু বিজ্ঞানীদের মৃত্যুরহস্য

২০০৯ থেকে ২০১৩— এই পাঁচ বছরে ভারতের দশজন বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী হয় খুন হয়েছেন, নয়তো রহস্যজনকভাবে আত্মহত্যা করেছেন। কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতে এর পিছনে রয়েছে সুগভীর চক্রান্ত। উদ্দেশ্য, পরমাণু বিজ্ঞানে ভারতের অগ্রগতিকে রোধ করা। আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে স্বস্তিকার আলোকপাত : ভারতের পরমাণু বিজ্ঞানীদের রহস্যমৃত্যুর পিছনে কারা? লিখেছেন সন্দীপ চক্রবর্তী।

বেঙ্গল
সামুই
ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই

ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী
গরম
মশলা

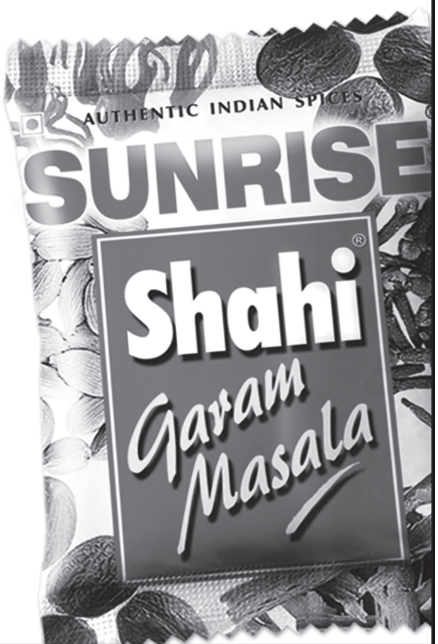

SUNRISE® PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নারদকাণ্ডে এফ আই আর

নারদকাণ্ডে এফ আই আর করিবার আগে প্রাথমিক তদন্ত চালাইবার জন্য সিবিআই-কে একমাস সময় দিয়াছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই এফ আই আর দায়ের করা হইল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্টিং অপারেশনের ভিডিও ফুটেজ প্রকাশিত হইবার পর হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল শাসিত রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই তদন্ত বহাল রাখে। সিবিআই-এর এফআইআর-এ ছয়জন সাংসদ, চারজন মন্ত্রী, একজন বিধায়ক, একজন প্রাক্তন মন্ত্রী এবং একজন আই পি এস অফিসারের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ বি ধারায় অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও সেই সঙ্গে দুর্নীতি দমন আইনের ৭,১৩ (১) এবং ১৩ (২) ধারাতেও মামলা রজু করা হইয়াছে। এই বিষয়ে সিবিআই-এর বক্তব্য হইল, বিশাল অঙ্কের টাকা না হইলেও এই ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের টাকা লইবার উদ্দেশ্যটাকেই বড় করিয়া দেখা হইয়াছে। যে সাতটি বিষয়ের ভিত্তিতে সিবিআই এফ আই আর করিয়াছে তাহার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল ম্যাথু স্যামুয়েলের স্বীকারোক্তি, পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণ, অভিযুক্তদের বক্তব্যের অসঙ্গতি। নারদ নিউজের কর্ণধার ম্যাথু এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাইয়াছেন। বস্তুত, নারদকাণ্ডকে রাজ্যের মন্ত্রী-নেতাদের দুর্নীতির একটি কণামাত্র বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছে সিবিআই। স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই প্রথম কোনো রাজনৈতিক দলের প্রথম সারির ১২ জন নেতার বিরুদ্ধে একসঙ্গে দুর্নীতির মামলা দায়ের করা হইল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এই বিষয়কে আমল দেন নাই। বিষয়টি তিনি রাজনৈতিক খেলা বলিয়া উল্লেখ করিয়া রাজনৈতিক ভাবে ইহার মোকাবিলা করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এফআইআর দায়ের হওয়ার পরই রোজভ্যালি কাণ্ডে জেল হেফাজতে থাকা সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখিতে ভুবনেশ্বরে যাইতেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নেত্রীর এই বার্তায় অভিযুক্তরা কতটা আশ্বস্ত থাকিতে পারিতেছেন তাহা অবশ্য সময়ই বলিবে।

পক্ষকাল আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে যাইয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তখন বিরোধী দল সিপিএম ও কংগ্রেস অভিযোগ করিয়াছিল যে নারদ ও সারদা কাণ্ড হইতে নেতা-মন্ত্রীদের রক্ষা করিতেই এইসাক্ষাৎকার। এফআইআর দায়ের করিবার ক্ষেত্রে সিবিআই বিলম্ব করিতেছে বলিয়াও অভিযোগ করা হইয়াছিল। তৃণমূল-বিজেপির সমঝোতার তত্ত্বও সিপিএম-কংগ্রেস নেতারা খাড়া করিয়াছিল। এখন আবার তাহাদের পক্ষ হইতে সিবিআই-এর এফআইআর-কে স্বাগত জানানো হইতেছে।

২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরে পরেই নারদ নিউজ স্টিং অপারেশনের মাধ্যমে তৃণমূলের একঝাঁক নেতামন্ত্রীর ঘুষ লইবার মামলাটি নাটকীয় মোড় নেয়। কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায় নিউ মার্কেট থানায় একটি এফআইআর দায়ের করিয়া জানান, ইচ্ছাকৃতভাবে মানহানির জন্য এই ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে। সেই অভিযো গের ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করিয়া আদালত তদন্তের দায়িত্ব সিবিআই-এর হাতে তুলিয়া দেয়। এ ফআইআর দায়ের করিবার পর সেই তদন্তের একটি পর্ব শেষ হইল বলা যায়। সিবিআই তদন্ত তাই সঠিক পথেই চলিতেছে। এই মামলার ন্যায়বিচার হইবে—ইহাই প্রত্যাশা।

সুভাষিতম্

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।। (উপনিষদ)

জীবাত্মা এক এবং অনন্য; কিন্তু প্রাণীতে প্রাণীতে পৃথক পৃথক ভাবে তিনি স্থিত বলে মনে হন। চন্দ্র এক হয়েও জলপূর্ণ বহু ঘটে প্রতিবিম্বিত হলে, সেই চন্দ্রকে বহু বলে দেখা যায়।

চৈত্র সংক্রান্তিতে স্বস্তিকার নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ চৈত্র সংক্রান্তির দিনটি বাঙালিদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বস্তিকা পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল এই দিনটি। স্থান কেশব ভবন। সময় সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটা। প্রেক্ষাগৃহ প্রথম থেকেই পরিপূর্ণ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ভাগ করা

হয়েছিল তিনটি পর্যায়ে। স্বস্তিকার নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ, স্বস্তিকা সম্মান প্রদান এবং পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক প্রয়াত ভবেন্দু ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা। বিষয় : জাতীয়তা এবং সংবাদমাধ্যম। বক্তা স্বনামধন্য সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পত্রিকার সহ-সম্পাদক সুকেশ মণ্ডল চমৎকার খেই ধরিয়ে দেন। স্বস্তিকার প্রকাশক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিবর্গ এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্বাগত জানিয়ে বলেন স্বস্তিকার জন্ম ১৯৪৮ সালে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এত দীর্ঘজীবী সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্ভবত আর একটিও নেই। তিনি স্বস্তিকাকে আরও বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন।

এরপর মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বস্তিকার নববর্ষ সংখ্যার আবরণ উন্মোচন করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রখ্যাত সাহিত্যিক শেখর সেনগুপ্ত, রন্তিদেব সেনগুপ্ত এবং রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সংখ্যা থেকে স্বস্তিকা রঙিন হলো। উপস্থিত সুধীজন নতুন চেহারার স্বস্তিকা পেয়ে নিজেদের খুশি ব্যক্ত করেন। পত্রিকা প্রকাশের পর স্বস্তিকা সম্মান প্রদান। এবারের সম্মান-প্রাপক বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর হাতে সম্মান তুলে দেন স্বস্তিকার সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য। মানপত্র পাঠ করেন অভিজিৎ চক্রবর্তী। সম্মানিত প্রণববাবু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে নাতিদীর্ঘ ভাষণে তুলে ধরেন ভারতের স্বাধীনোত্তর ইতিহাসের মাইলফলকগুলি।

স্বস্তিকা সম্বন্ধে যারা খবর রাখেন তাঁরা জানেন এই পত্রিকাটির চারাগাছ থেকে মহীরুহ হয়ে ওঠার পিছনে প্রাক্তন সম্পাদক প্রয়াত ভবেন্দু ভট্টাচার্যের অবদান ঠিক কতখানি। বস্তুত স্বস্তিকা তাঁরই সত্তাজাত পিতার শাসন এবং মায়ের মমতায় বেড়ে উঠেছে। আজ যা দেখা যাচ্ছে তা তাঁর দিকদর্শনের ফল। স্বস্তিকার বর্তমান পরিচালকবর্গ এবং কর্মীরা তাঁদের প্রেরণাপুরুষকে ভোলেননি। তাঁর স্মৃতিতে আয়োজন করেছেন ভবেন্দু ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতার। এবারের বিষয় ছিল জাতীয়তা এবং সংবাদমাধ্যম। বক্তা রন্তিদেব সেনগুপ্ত। বক্তব্যের শুরুতেই রন্তিদেববাবু সংবাদপত্রের ইতিহাস ব্যক্ত করেন। চিহ্নিত করেন স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা। স্বাধীনতার আগে যেসব সংবাদপত্র ছিল জাতীয়তাবোধে সম্পন্ন, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের হাজার চোখ রাঙানিতে অবিচল— স্বাধীনতার পরে তারা সেই সত্তা হারিয়ে ফেলে। গোষ্ঠীস্বার্থের পূজারি, নেহরুবাদী এবং বামপন্থী রাজনীতির মুখপত্র হতে গিয়ে তারা মেকলে-কথিত সমাজনীতির পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠল। রন্তিদেববাবুর ভাষায়, এর পিছনে রয়েছে সংবাদপত্র-মালিকদের বাণিজ্যিক লোভ। পাঠককে পাঠক হিসেবে না দেখে বাজার হিসেবে দেখার হীন মানসিকতা।

অনুষ্ঠানে অসাধারণ বক্তব্য পেশ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল চন্দ্র বিশ্বাস। তিনি বলেন, স্বস্তিকার লড়াই সত্যকে প্রকাশ করার লড়াই। তাঁর অভিযোগ, বাংলা ভাষায় অনেক বড়ো বড়ো কাগজ আছে। কিন্তু হিন্দু সমাজ যখন সাম্প্রদায়িক আক্রমণের শিকার হয় তখন কলম স্তব্ধ থাকে। এগিয়ে আসে শুধু স্বস্তিকা। এদিন ছিল বাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্মদিন। শ্রী বিশ্বাস বলেন, প্রত্যেক ভারতীয় পরিবারে বাবাসাহেবের ছবি থাকা উচিত। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ঠিক কী বোঝায় ওই মানুষটার মতো আর কেউ এদেশে বোঝেননি। অনুষ্ঠানের সভাপতি সুলেখক শেখর সেনগুপ্ত সাম্প্রতিক রামনবমী উপলক্ষে সশস্ত্র মিছিলকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত বিতর্ক প্রসঙ্গে বামপন্থীদের তীব্র সমালোচনা করেন।

শেখরবাবু বলেন, বামপন্থীদের অস্ত্র হাতে মিছিল করতে তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। যেদিন দেখেছিলেন তার কয়েকদিন পরেই কুখ্যাত সাইবাড়ি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। তাঁর প্রশ্ন, এরপর যদি বামপন্থীরা রামনবমীর মিছিলের সমালোচনা করে তাহলে তা মানা যায় কি? অনুষ্ঠান শেষে স্বস্তিকার লেখক সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ইতিহাসবিদকে স্বস্তিকা সম্মান

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়ের হাতে মানপত্র তুলে দিচ্ছেন ড. বিজয় আঢ্য।

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসচর্চার আলো সব জায়গায় পড়ে না। তাই ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু বহু মানুষ আলোর বৃত্তটি আরও বিস্তৃত করে ব্যাপকতর পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে। ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় এরকমই একজন মানুষ। ইতিহাসের রাজপথ থেকে অলিগলি— সর্বত্র তাঁর অনায়াস পরিক্রমণ স্বীকার করে ১৪২৩-এর স্বস্তিকা সম্মান তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হলো গত চৈত্র সংক্রান্তির দিন।

১৯৪৮-এর শুভ জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে আজ অবধি স্বস্তিকা পত্রিকা আগাগোড়া প্রতিষ্ঠান বিরোধী। ভেজাল সর্বস্বতার যুগে যেখানে আদর্শেও ভেজাল দেবার রীতি আছে সেখানে স্বস্তিকা সম্পূর্ণ নিখাদ, নিষ্কলুষ। স্বস্তিকা সম্মানের প্রেক্ষাপট বিচার করলেও এই কথার যাথার্থ্য পরিস্ফুট হয়। এর আগে এই সম্মান পেয়েছেন সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন সেনাপ্রমুখ কে. কে. গঙ্গোপাধ্যায় এবং নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক বিকাশ ভট্টাচার্য। এঁরা কেউই প্রতিষ্ঠান-পোষিত নন। বাইরের পাঁচরকমের গোলমালে অন্তরের সুরটি হারিয়ে ফেলেননি। সেই দিক থেকে বিচার করলে ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচন সার্থক। প্রণববাবু কলেজে পড়িয়েছেন, গবেষণা করেছেন, অধ্যক্ষতা করেছেন— অবসর নেওয়ার পর সরকারি লেখ্যাগারের অধিকর্তা হয়েছেন, সেই সঙ্গে দশচক্রে ভূত হয়ে যাওয়া ভারতীয়ত্বের ইতিহাসকে তার স্বধর্মে ফিরিয়ে আনতেও সচেষ্ট থেকেছেন।

এদিন ড. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়কে উত্তরীয় পরিয়ে অভ্যর্থনা করেন স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য। তারপর তাঁর হাতে সম্মান তুলে দেওয়া হয়। মানপত্র পাঠ করেন অভিজিৎ চক্রবর্তী। প্রণববাবু স্বস্তিকা পরিবারকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, বাংলাভাষী মানুষের জাতীয়তাবোধের বিকাশে স্বস্তিকা নিরন্তর কাজ করে চলেছে। তাঁর বক্তব্যে ভারতের ইতিহাসের চারটি মাইলফলকের কথা উঠে আসে। ৪৭-৪৮-এ ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং দেশভাগের যন্ত্রণা। বস্তুত এই যন্ত্রণার প্রেক্ষাপটেই স্বস্তিকার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা।

দ্বিতীয় মাইলফলক সত্তরের দশক। এই সময় সারা দেশ নকশাল আন্দোলন এবং জরুরি অবস্থার কারণে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। এবং এই সময় থেকেই আঞ্চলিক রাজনীতির রমরমার শুরু। পরের মাইলফলক ১৯৯০-৯২-তে। এই সময় শুরু হলো শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলন। হিন্দু সমাজকে আত্মপরিচয়ের সঙ্কট থেকে বের করে আনার জন্য সচেষ্ট হলো জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন দেশীয় শক্তিগুলি। সব শেষে ২০১৪। বিজেপির যুগান্তকারী উত্থান এবং নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্ব। বস্তুত এই সময়েই ভারতের পরম্পরাগত ঐতিহ্য পা রাখল উত্তর আধুনিক দুনিয়ায়।

গঙ্গা দূষণ রোধে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গঙ্গা দূষণ রোধে কেন্দ্রীয় সরকার অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস, সেনা এবং প্যারামিলিটারি বাহিনীর আধিকারিকদের নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই বাহিনী স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সাজুয্য রেখে গঙ্গা পুনর্জীবন প্রকল্পে কাজ করবে। সেই সঙ্গে গঙ্গার ক্রমবর্ধমান দূষণ রোধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

সরকারি সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, প্রস্তাবিত স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ— এই পাঁচ রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা সমগ্র গঙ্গাক্ষেত্রে (২৫২৫ কিলোমিটার) নজরদারি করবে। এক সরকারি আধিকারিক বলেন, 'অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি গিরিধর মালব্যের নেতৃত্বাধীন কমিটি এরকম একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠনের জন্য কেন্দ্রকে প্রস্তাব দিয়েছে। প্রস্তাবে বাহিনীর সদস্যদের নিয়োগ পদ্ধতি, কাজের মেয়াদ, ক্ষমতা প্রসঙ্গে বিস্তারিত নির্দেশ রয়েছে। কেন্দ্র যত শীঘ্র সম্ভব এই বাহিনী গঠন করতে চায়।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা কিছু দিনের মধ্যেই রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসব।' তিনি জানান, এই বাহিনীর ৬০ শতাংশ কার্যকর্তা নেওয়া হবে সেনা এবং প্যারামিলিটারি ফোর্সের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকদের মধ্য থেকে। ২০ শতাংশ গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলবর্তী রাজ্যগুলির নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী এবং হোমগার্ডদের মধ্য থেকে। ১০ শতাংশ সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস এবং অন্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের ভেতর থেকে। বাকি দশ শতাংশ নেওয়া যুবকেন্দ্র সংগঠন (এন ওয়াই কে এস) এবং অন্য সমাজসেবী সংস্থাগুলি থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মালব্য কমিটি গঙ্গার পুনর্জীবন সংক্রান্ত খসড়া আইন ন্যাশনাল রিভার গঙ্গা (রেজুভিনেশন, প্রোটেকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট) বিল, ২০১৭ পেশ করেছে। কেন্দ্রীয় জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী উমা ভারতী একথা জানিয়েছেন।

বাঙালি ভোটারের মনবদল, তৃণমূলের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১১ পর্যন্ত তীব্র সিপিএম বিরোধিতাই ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধানতম অ্যাজেন্ডা। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের পর মমতা তাঁর ফোকাস বদলাতে শুরু করেছিলেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনগুলিতে তার কারণ স্পষ্ট বোঝা গেল। বিজেপিই এখন মমতার একমাত্র প্রতিপক্ষ। প্রধান বিরোধী শক্তিও। কারণ ২০০৯ সাল থেকে ক্রমাগত রক্তক্ষরণে ক্লান্ত সিপিএম প্রায় ময়দান-ছাড়া।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল ১৬ শতাংশ ভোট। তারপর ভোট বাড়িয়ে কোচবিহার উপনির্বাচনে পেল ২৮.৩২ শতাংশ এবং সাম্প্রতিকতম দক্ষিণ কাঁথি উপনির্বাচনে পেয়েছে ৩০.৯৭ শতাংশ। ভোটপ্রাপ্তির এই ক্রমিক উত্তরণে একটা বিষয় প্রমাণিত পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি আর অবাঙালিদের দল নয়। মমতা বিরোধী বামভক্ত বাঙালি ভোটারদের একটা বড়ো অংশ এখন বিজেপি-মুখী। তাঁরা বুঝতে পারছেন পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল শাসনে ইতি টানতে হলে বিজেপি ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

অন্যদিকে, বিজেপির ভোটবৃদ্ধি এবং কংগ্রেস-সিপিএমের সম্মিলিত ভোট ১৫ শতাংশে নেমে যাওয়া, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। একই অবস্থা ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কেরও। বস্তুত বিরোধীদের ভোট ভাগাভাগির সুযোগ নিয়েই এই দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা এতদিন বহাল তবিয়তে ছিলেন। সম্ভবত এই কারণেই সম্প্রতি নবীন পট্টনায়ক দিল্লিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিজেপির ভোটবৃদ্ধিতে কতখানি শঙ্কিত তার প্রমাণ পাওয়া যায় তৃণমূলের এক প্রথম সারির নেতার কথায়। ভোটের ফল প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি বলেন, 'বামেরা এত খারাপ ফল কী করে করল?' মজার ব্যাপার এটাই, বাঁচার জন্য চিরশত্রু বামেদেরই ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন তৃণমূল নেতারা।

বিজেপির রাজ্যসভাপতি দিলীপ ঘোষ চূড়ান্ত আশাবাদী। তিনি বলেন, 'পঞ্চায়েত ভোট পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। ২০২১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরোপুরি ছুঁড়ে ফেলার আগে রাজ্যের মানুষ এরকম অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটাবেন।'

আজানে বিরক্ত সোনু নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আজানের নামে লাউড স্পিকারের দৌরাত্ম্য দিন-দিন বাড়ছে। হিন্দি সিনেমার বিখ্যাত গায়ক সোনু নিগম সম্প্রতি এক টুইট বার্তায় আজান নিয়ে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অভিযোগ, তাঁর বাড়ির তিনদিকেই মসজিদ। প্রতিদিন ভোরবেলায় লাউড-স্পিকারবাহিত আজানের তীব্র শব্দে সকলের ঘুম ভেঙে যায়। টুইটারে সোনুর ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা, 'আমাদের দেশের এই জোরজবরদোস্তির ধর্মকর্ম কবে শেষ হবে?' অন্য এক টুইটার বার্তায় তিনি লেখেন, হজরত মহম্মদ যখন ইসলাম ধর্মপ্রতিষ্ঠা করেন তখন লাউড স্পিকার আবিষ্কার হয়নি। ১৪০০ বছর ধরে মুসলমানরা লাউডস্পিকার ছাড়াই তাদের ধর্মকর্ম করেছে। তাহলে এখন ওই অত্যাচার কেন? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নাইজেরিয়া, সৌদি আরব, মিশর, ইন্দোনেশিয়ার মতো ইসলামি দেশগুলিতেও মসজিদে লাউড স্পিকারের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত। একমাত্র ভারতেই কোনো বিধিনিষেধ নেই। একই এলাকায় তিনটি মসজিদে একসঙ্গে লাউড স্পিকারে চিৎকার জুড়লেও কেউ প্রশ্ন করে না।

সংসদীয় কমিটির সুপারিশ

হিন্দি জানলে হিন্দিতে সংসদীয় বিবৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মন্ত্রীদের যাবতীয় বিবৃতি হিন্দিতে দেবার নিয়ম চালু করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি একটি সংসদীয় কমিটি কেন্দ্রকে এই সুপারিশ করেছে। এখন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুমোদন পেলেই কেন্দ্র এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরা ইংরেজিতে বিবৃতি দিয়ে থাকেন। পরে সেই বিবৃতি হিন্দিতে অনুবাদ করা হয়।

সূত্রের খবর, রাষ্ট্রপতি ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি সুপারিশ অনুমোদন করেছেন। বাকি আছে আরও কয়েকটি। মূল সুপারিশটি এইরকম : 'রাষ্ট্রপতি-সহ কেন্দ্র ও রাজ্যের যেসব মন্ত্রী হিন্দি পড়তে ও বলতে পারেন তাদের উচিত হিন্দিতে সরকারি বিবৃতি দেওয়া।' ২০১১-য় গঠিত এই কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদাম্বরম। সরকারি সূত্রটি জানিয়েছে, হিন্দিভাষী রাজ্যগুলির মধ্যে মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থানে যাবতীয় সরকারি কাজকর্ম হিন্দিতেই হয়। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্ম হয় ইংরেজিতে। সরকারি বিমান পরিষেবা সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়ার টিকিটেও হিন্দি ভাষা ব্যবহার করার সুপারিশ করেছে কমিটি।

খড়্গাপুর আই আই টি-তে বাস্তুশাস্ত্রের পাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ একজন ছাত্র বা ছাত্রী কোনোভাবেই স্থাপত্যবিদ্যায় সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না যতক্ষণ না তার বাস্তুশাস্ত্রের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়। বাস্তুশাস্ত্র এমন এক শাস্ত্র যার ওপর নির্ভর করে ভারতের সনাতন স্থাপত্যবিদ্যা গড়ে উঠেছে। এমনই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে আই আই টি খড়্গাপুরের পক্ষ থেকে। এ বছরের আগস্ট মাস থেকে স্থাপত্যবিদ্যার প্রথম

ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের বাস্তুশাস্ত্রের পাঠ দেবে ভারতের সব থেকে বৃহৎ ও প্রাচীন কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি। সেই সঙ্গে স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রছাত্রীদের এবং গবেষকদেরও বাস্তুশাস্ত্র সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানার সুযোগ থাকবে।

স্থাপত্যবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসেবে বাস্তুশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করার রেওয়াজ ভারতের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছিল না। কিন্তু খড়্গাপুর আইআইটির অধ্যাপকরা মনে করছেন ছাত্রছাত্রীরা যদি পশ্চিমি দেশগুলিতে উদ্ভাবিত স্থাপত্যবিদ্যার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জানার সুযোগ পায় তাহলে ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যবিদ্যা বাস্তুশাস্ত্র সম্বন্ধে জানার সুযোগ পাবে না কেন? তাঁরা এও বলেছেন বাস্তুর সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। উপরন্তু ভারতের প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে। এই বিষয়ে পঠন-পাঠন শুরু হলে স্থাপত্যের অনেক অনাবিষ্কৃত পথ খুলে যাবে বলে তাঁরা মনে করছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি আইআইটি খড়্গাপুরের শাখা প্রতিষ্ঠান রণবীর এবং চিত্রা গুপ্ত স্কুল অব ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডিজাইন ম্যানেজমেন্ট 'বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তু' শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করে। সারা দেশের বহু বিখ্যাত বাস্তু বিশারদ তাতে অংশ নেন। উদ্যোক্তা সংস্থার কর্ণধার জয় সেন বলেন, 'এখন সময় বদলে গেছে। সারা পৃথিবীতে ভারতের প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে বাস্তুশাস্ত্র যে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হবে সেটা স্বাভাবিক!

উবাচ

"সত্য প্রকাশের জন্য এফআইআর হলো প্রথম পদক্ষেপ। এফআইআর থেকে বোঝা যাচ্ছে তদন্তকারী সংস্থা এটাকে ষড়যন্ত্র হিসেবে বাতিল করেনি। অন্যদিকে অভিযুক্তদের তালিকায় আমার নাম নেই।"

ম্যাথু স্যামুয়েল
নারদ নিউজ এজেন্সির প্রধান

নারদকাণ্ডে এফআইআর প্রসঙ্গে।

"দেশে এখন একটা নতুন বিতর্ক দেখা দিয়েছে। নানা বক্তব্য শোনা যাচ্ছে। কোনো কোনো মহল এই নিয়ে নীরব। এই ধর্ষণের ইস্যুতে তাদের যখন নীরব দেখি, মহাভারতের একটা ঘটনার কথা (দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ) মনে পড়ে।"

যোগী আদিত্যনাথ
উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

তালাক নিয়ে মুসলিম ল' বোর্ডের সমর্থন প্রসঙ্গে।

"সামাজিক ন্যায়বিচার মুসলমানদের কাছেও পৌঁছনো উচিত। কিন্তু তা পৌঁছতে হবে আলোচনার মাধ্যমে, বিবাদের দ্বারা নয়।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

ভুবনেশ্বরে বিজেপি জাতীয় কর্মসমিতির সভায় মুসলমান মহিলাদের উদ্বেগ প্রসঙ্গে।

"তিন তালাক 'মন্দ' কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের সমাধানে এখনও 'বৈধ'।"

মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড

তিন তালাক প্রসঙ্গে।

"পিতার নাম ডিগ্রি-সার্টিফিকেটের জন্য জরুরি নয়।"

মানেকা গান্ধী
কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী

কুমারী মায়ের সন্তান প্রসঙ্গে।

সূর্য নমস্কার ও নমাজ

দেবাশিস আইয়ার

যোগ দিবস পালনে মুসলমানদের কী সত্যিই বাধা থাকার কথা! কী এমন আছে যাতে তারা বাধা দিচ্ছে। যোগ যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক তা যখন সারা বিশ্ব মান্যতা দিয়ে ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ঘোষণা করেছে তখন যোগ মুসলমান সংস্কৃতির বিরোধী এই অজুহাতে যারা বাধা দিচ্ছে তারা কি প্রকারান্তরে ভারত বিরোধিতাই করছে না? তারা কি জানে পয়গম্বর প্রদর্শিত নমাজের প্রক্রিয়া যোগ

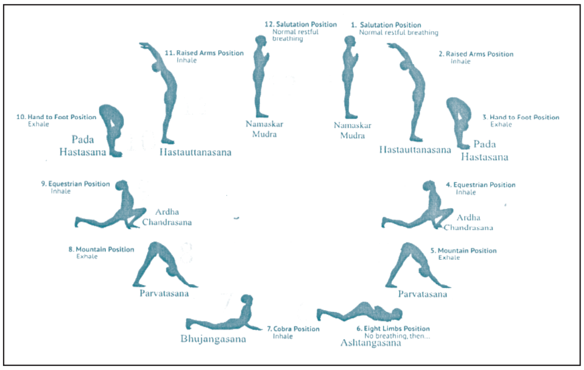

ছাড়া কিছুই নয়? যে সূর্য নমস্কারকে তারা ইসলাম বিরোধী বলছে নমাজ আসলে তারই প্রকারভেদ।

সূর্য নমস্কারের সম্পূর্ণ কাজটি মূলত ১২টি ধাপে হয়। যার মধ্যে ৮টি বিভিন্ন ভঙ্গিমার আসন রয়েছে। তাই বিভিন্ন প্রাচীন শাস্ত্রে একে অনেক জায়গায় অষ্টাঙ্গ বিন্যাস যোগ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ৮টি আসন হলো— নমস্কার মুদ্রা, হস্তউত্থানাসন, পদহস্তাসন, একপদ প্রসারণাসন/অর্ধচন্দ্রাসন, সশকাসন, অষ্টাঙ্গাসন,ভুজঙ্গাসন, অধঃমুখশ্বনাসন / পর্বতাসন। সূর্যনমস্কারের ধর্মীয় বিষয় হলো সূর্যকে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় প্রণাম জানানো এবং সেই প্রণামের সময় নিজ মনপ্রাণকে সূর্যশক্তির সঙ্গে একাত্ম অনুভব করা। আর এর শারীরিক দিক হলো সমস্ত শরীরের সঞ্চালনের মাধ্যমে শরীর-মনকে সুস্থ-সবল করা। ঠিক তেমনি, নমাজ তথা সালাহ (প্রার্থনা) কাজটি মূলত ৮টি ধাপে হয়। আরবি ভাষায় এই ৮টি ভঙ্গিমাকে বলে তকবীরত, অল-কোইয়াম, রুকু, কোইয়াম, সাজদা, জুলুস, তাসাহুদ এবং সালাম। এই ৮টি ভঙ্গিমা যোগ শাস্ত্রের মূলত ৫টি আসন নিয়ে তৈরি। সেগুলি হলো— তাড়াসন, অর্ধউত্থানাসন, শশকাসন, বজ্রাসন এবং প্রণমাসন।

হাদিস অনুযায়ী ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ (৫ বার নামাজ) অন্যতম। প্রতিবার নমাজ কাজটি যথার্থ ভাবে সম্পূর্ণ করতে ১৫-২০ মিনিট সময় লাগে। অর্থাৎ ইসলাম মতে দিনে ৫ বার ১৫ মিনিট করে নামাজের মাধ্যমে এই শরীর সঞ্চালন তথা যোগাসন করা অনিবার্য। আর সেই জন্য ধার্মিক মুসলমানরা শারীরিক ভাবে অনেক বেশি পটু হয়।

নমাজের ধর্মীয় দিক হলো আল্লাহের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পণ। তাই সূর্য নমস্কারের সময় যদি আল্লাহের নাম নিতে নিতে সূর্য নমস্কারের আসন ভঙ্গিমা করা হয় তাহলে তো

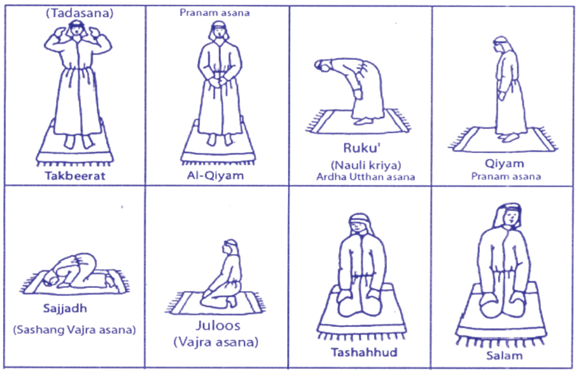

কোনো আপত্তি থাকারই কথা নয়। তাহলে যে কয়েকজন ধর্মগুরু এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছে তারা যুক্তিগত ভাবেই তা জানিয়েছেন না এখানে আরবের নিয়ম কার্যকর করে ভারতকে আরবি-বাবরি প্রেমীদের ভূমি বানাতে চাইছে তা কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়। উত্তরটা কে দেবেন— সেই সমস্ত ইসলামি ধর্মগুরুরা না তাদের সেকুলারি তোষামোদীরা? আর এই সব ভণ্ডামি দেখেশুনে এক ভারতপ্রেমীর মন্তব্য, তোষামোদীর সঙ্গে থাকার চেয়ে মোদীর সঙ্গে থাকা অনেক ভালো।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

বাংলাকে উত্তরপ্রদেশ বানাবেন দিদি নিজেই, দিলীপ ঘোষ কম খাটুন

মাননীয় দিলীপ ঘোষ
সভাপতি, রাজ্য বিজেপি
৬ মুরলীধর সেন লেন, কলকাতা

দাদা, প্লিজ একটা রিকোয়েস্ট রাখবেন। আপনি বাংলা চষে বেড়াচ্ছেন বেড়ান কিন্তু দিদিকে এত বিরক্ত করবেন না। দিদি আজকাল মেজাজ ঠিক রাখতে পারছেন না। এই তো দেখলেন না, সেদিন পুরুলিয়ায় মিটিংফিটিং ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। যাবেন না! উনি প্রশাসনিক বৈঠক করছেন এমন সময়ে যদি একটা এসএমএস আসে যে, ওই শহরেই রামভক্তদের বিশাল মিছিল বের হয়েছে তাতে কি মাথার ঠিক থাকে বলুন তো!

সারদা, রোজভ্যালি, নারদ নিয়ে দিদি অত চিন্তিত নন। উনি এসব দুর্নীতি সামলাতে জানেন। এক দল চোর জেলে গেলে আর এক দলকে তিনি সামনের সারিতে নিয়ে আসবেন। নিজেই বলে রেখেছেন। কে কে জেলে যাবে তা ভালই জানেন। সামনেই সাংগঠনিক রদবদল করে জেলযাত্রীদের দায়িত্ব কমিয়ে দেবেন বলে আগেই ঠিক করে রেখেছেন।

দিলীপবাবু দোহাই আপনাকে, দিদিকে অত চ্যালেঞ্জ দেবেন না। এই যে কাঁথিতে ভোট হলো। দিদি জিতলেন। কিন্তু জয়ের আনন্দ কি পেলেন! আপনাদের জন্য দিদির এই করুণ অবস্থা। চোখে দেখা যায় না। কাঁথির উপনির্বাচনে এই রকম করাটা মোটেও ঠিক হয়নি। ২০১৬ সালে আপনাদের ভোট ছিল ৮ শতাংশ। ২০১৭ সালে সেটাই হয়ে গেল ৩১ শতাংশ। ইয়ার্কি পেয়েছেন নাকি!

দিলীপবাবু এবার কাজের কথা বলি। দিদি আরও বিপদে আছেন। বিপদ বুঝে ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এ নিয়ে তৃণমূলে কারও ক্ষোভ থাকার কথা নয়। কংগ্রেস কালচারে পরিবারতন্ত্র কিছু অবাক হওয়ার ঘটনা নয়। 'না' বলার অধিকার, ক্ষমতা বা সাহস কারোরই নেই। তবু দিদির দলে বিক্ষোভ জমছে।

বিক্ষোভ বাড়ছে অভিষেকের ক্ষমতায়নের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু বড় বদলের আশঙ্কায়। ২০১১ সালে প্রথমবার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরে ২১ জুলাই মঞ্চ থেকে 'যুবা' নামে সংগঠন ঘোষণা করে তার দায়িত্ব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেন মমতা। এর পরে দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসার পরে 'যুবা'-কে তৃণমূল কংগ্রেসে মিলিয়ে দেন। শুভেন্দু অধিকারীকে সরিয়ে যুবা-র রাজ্য সভাপতি হন অভিষেক। প্রথম ইঙ্গিতেই দলের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার্তা দিয়ে দিয়েছিলেন— উত্তরসূরী তৈরি।

আগামী ২১ এপ্রিল তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন। নিয়ম রক্ষার এই নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের চেয়ারপার্সন করা হবে। সেই সঙ্গে তৈরি হবে দলের ওয়ার্কিং কমিটি। তাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জায়গা হচ্ছে। এই প্রথম মূল সংগঠনে জায়গা পেতে চলেছেন অভিষেক। আগামী দিনে তিনিই হবেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সিনিয়রদের টপকে একই সঙ্গে তিনি উপমুখ্যমন্ত্রীও হতে পারেন। দিদির পরিবারেও আরও কেউ কেউ অভিষেকের হাত ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পথে হাঁটবেন। হাঁটবেনই।

সুতরাং, আপনার বেশি চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই দিলীপবাবু। এর পরে অপেক্ষা করুন মমতা তৃণমূল আর অভিষেক তৃণমূল দেখার জন্য। একেবারে উত্তরপ্রদেশের পটভূমিকা। ওখানে ছিল সাইকেল নিয়ে টানাটানি। এখানে হবে ঘাসফুল নিয়ে টানাটানি। সেই টানাটানিতে কার হাতে পাতা আর কার হাতে পাপড়ি থাকবে সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করুন। একই সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সৎ ও অসৎ বিভাজন তৈরি হয়ে গিয়েছে। সেটাও বড় আকার ধারণ করবে পঞ্চায়েত ভোটের পরে পরেই। আগেও হতে পারে।

অনেকে বলবেন এও কি সম্ভব! আমি বলছি দিলীপবাবু এটা হবেই। এটাই ফ্যামিলি পলিটিক্স-এর ভবিষ্যৎ। ইতিহাস তাই বলছে। পরিবার-রাজনীতির সেই শিক্ষাই পেয়েছেন লালুপ্রসাদ থেকে মুলায়ম যাদবরা।

আমি জানি, আপনি আমার পরামর্শ শুনে বিশ্রাম নেবেন না। দলের বাকিদেরও গা এলিয়ে দিতে দেবেন না। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহরাও বাংলার মাটিকে দুর্জয় ঘাঁটি বানাতে কোমর বাঁধবেন। তাই এখন যাঁরা তৃণমূল বিরোধী ভোট নিয়ে হিসেব কষছেন তাঁরা আগামী বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি বিরোধী ভোট কে কতটা পাবে, তার হিসেব করতে বাধ্য হবেন।

—সুন্দর মৌলিক

হিন্দুশক্তির উত্থানে স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীরা বিষোদ্গার করে চলেছেন

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

বেশ কিছুকাল ধরে কিছু স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবী, স্বার্থান্বেষী নেতা ও আত্মগর্বী সাংবাদিক বিজেপি ও তার সহযোগিদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে চলেছেন। তাদের বিরুদ্ধে 'মেরুকরণ', 'গৈরিকীকরণ', 'বিভাজন- সৃষ্টি', 'ধর্মান্ধতা', 'দেশ বিভাজনের ষড়যন্ত্র' ইত্যাদি অভিযোগ তোলা হয়েছে। অথচ এই দল ও তার সঙ্গীরা কেন্দ্রে চারবার ও বিভিন্ন রাজ্যে কয়েকবার ক্ষমতায় বসলেও ধর্মীয় দিক থেকে কোনো বিভাজন করেনি, একজন সংখ্যালঘু মানুষকেও বিতাড়িত করেনি, বাহুবলে ধর্মান্তরিত করেনি, পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয় জিগির আনেনি বা নতুন করে তাদের কর্মসূচি বা তত্ত্বকে অন্তর্ভুক্ত করেনি।

তাহলে সংবাদপত্র বা দূরদর্শন খুললেই ওই সব ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ ও আত্মম্ভরী ব্যক্তিদের কণ্ঠ শুনি বা অশ্রদ্ধেয় লেখা পড়ি। মনে হয়, ক্ষমতা থাকলে তাঁরা পূর্বোক্ত নেতাদের গর্দান নিতেন বা বনবাসে পাঠাতেন। বিশেষ করে, পাঁচটা রাজ্য বিধানসভার সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হওয়ার পর এই ক্রোধ ও ঘৃণার পরিমাণ একশো গুণ বেড়ে গেছে। এতে মোট ৬৯০ টি আসনের জন্য ভোট হয়েছিল। তাতে বিজেপি ও তার সঙ্গীরা পেয়েছে ৪৩৪টি আসন, কংগ্রেস ১৪০, এসপি ৪৭, বিএসপি ১৯ এবং বামজোট ০। সুতরাং বলা যায়— অন্যরা প্রায় ধুয়ে মুছে গেছে। শুধু পঞ্জাবে কংগ্রেস ৭৭টি আসন পেয়ে সরকার গঠন করেছে। অন্য চারটি রাজ্যে তার আসন জুটেছে মাত্র ৬৩টি।

উত্তরপ্রদেশের ৪০৩টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৩২৫টি, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস কিন্তু সমাজবাদী দলের সঙ্গে জোট করে মাত্র ৫৪টি আসন পেয়েছে— তার নিজের আসন মাত্র ৭টি। মণিপুর ও গোয়াতে অবশ্য কংগ্রেস এগিয়ে গেছে যথাক্রমে ২৮টি ও ১৮টি আসন পেয়ে। বিজেপি পেয়েছে ১৩টি আসন। কিন্তু অন্য কয়েকটা আঞ্চলিক দল বিজেপি-কে সমর্থন জানিয়েছে, কয়েকজন নির্দল বিধায়কও গেছেন তার দিকে--- এমনকী মণিপুরে একজন তৃণমূল-বিধায়ক সরকার গঠনে বিজেপিকে সমর্থন করেছেন। তার ফলে ওই দুটো রাজ্য গেছে তার দখলে। কিন্তু উত্তরাখণ্ডে বিজেপির জয়-জয়কার ঘটেছে, ৭০টি আসনের মধ্যে তার ভাগে জুটেছে ৫৭টি আসন, কংগ্রেস সেখানে পেয়েছে মাত্র ১১টি।

এই ফলাফল বিরোধী-নেতা, পণ্ডিতমন্য বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকদের হতাশ, বিভ্রান্ত ও ক্রুদ্ধ করে তুলেছেন। কেউ বলেছে— ইভিএম মেসিন খারাপ ছিল। কেউ জানিয়েছেন— এই সব রাজ্যে টাকার খেলা চলেছিল। কারও মতে— বিজেপি হিন্দু তাস খেলেছে। কেউ কেউ আবার বলেছেন— নরেন্দ্র মোদীকে হঠিয়ে ছাড়বেন। মণিপুরে কংগ্রেস মামলা করেছিল— কিন্তু তাতে তার মুখই পুড়েছে।

বিজেপি কিন্তু এই সব রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল না যে, রিগিং-এর সুযোগ পাবে, ভোটযন্ত্রও তার হাতে ছিল না, টাকা অন্যদেরও কম নেই। আর উত্তরপ্রদেশে হিন্দু তাস খেললেও অন্য ধর্মের মানুষ কিন্তু সেখানে কম নেই। আরও বড় কথা হলো— অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিই কম্বুকণ্ঠে ভবিষদ্বাণী করেছিলেন— নরেন্দ্র মোদীর নোট-নীতি ওই দলকে ডুবিয়ে ছাড়বে। কিন্তু সেটাও ঘটেনি। আসলে, কোথায় বিজেপির শক্তির উৎসটা রয়েছে— সেটা বোঝার মতো মস্তিষ্ক এইসব বোদ্ধাদের আদৌ নেই। ১৯৮২ সালে প্রথম আবির্ভাবের পর এই দল লোকসভার নির্বাচনে অংশ নিয়ে মাত্র ২টি আসন পেয়েছিল। সেই দলটাই পরে যেমন করে হোক চারবার কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছে এবং কয়েকবার কিছু কিছু রাজ্যের মসনদ দখল করেছে— সেটা বুদ্ধি, অনুভূতি ও বিশ্লেষণ-শক্তির দ্বারা অবিষ্কার করার দরকার ছিল। কিন্তু তার বদলে এইসব নেতা, বুদ্ধিজীবী ও কিছু সাংবাদিক ক্রোধ উচ্ছ্বাসকেই আশ্রয় করেছেন।

এটা ঠিক যে, বিজেপি হিন্দুত্বের কথা বলে যাবে। কিন্তু কখনও এই দল ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রচার করেছে? একজন সংখ্যালঘুকেও বিতাড়িত করেছে? স্কুল-কলেজের সিলেবাসে বদল করেছে? নরেন্দ্র মোদী শপথ গ্রহণের আগে বারাণসীতে পুজো দিয়েছিলেন। কিন্তু 'সেকুলার' রাষ্ট্রে নিজের ধর্মকে অনুসরণ করা যাবে না? ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ বারাণসীর মন্দিরে পুজো দিয়েছিলেন ও সোমনাথ মন্দির (মুসলিম লুণ্ঠিত) দর্শন করেছিলেন— তাতে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আসলে, তাঁর মতো মেকি 'প্রগতিশীলরাই 'সেকুলার' কথাটার অর্থ বোঝেননি। এখনও তাঁর মতো প্রগতিশীলরাই শব্দটার বিকৃত অর্থ তৈরি করে বিভাজন এনেছেন এবং 'ধর্ম' কথাটির প্রদত্ত ব্যাখ্যা করেছেন। ড. এম এন সিক্রি মন্তব্য করেছেন, 'a Hindu is to-day accepted as Sacular only if he pro-Muslim and perhaps, pro-other minorities'— (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ২৯২)। এক মহাবিজ্ঞ পত্রিকা-সম্পাদক তাঁর কলমে লিখেছিলেন— 'সেকুলারজিমের উপর দাঁড়াইয়া হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইবে।' বলা বাহুল্য— 'সেকুলারিজম' ও 'হিন্দুত্ব' দুটো শব্দের অর্থই তাঁর অজানা।

সেকুলার রাষ্ট্র কোনো ধর্মকেই প্রাধান্য দেয় না এবং কোথাও ধর্মাবলম্বীর পক্ষে বা বিপক্ষে থাকে না। ড. এম ভি পাইলি লিখেছেন— 'A sacular state...gives protection to all religion equally...'—

(অ্যান্ ইনট্রোডাকশান টু দ্য কনস্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ১২৪)। ভারত ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলার-নীতি গ্রহণ করেছে বলে হিন্দুত্বের বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হবে?

আচ্ছা, 'হিন্দুত্ব' কথাটার অর্থ কি? 'হিন্দু' শব্দটা শুধু একটা ধর্মকে বোঝায় না— এর একটা জাতিগত ও দার্শনিক দিকও আছে। সুপ্রিম কোর্টের মতে--- এটাতে একটা জীবনদর্শনও ('way of like') বোঝায়। রামচরণ শর্মা জানিয়েছেন, আর্যরা সিন্ধুনদের তীরে বসতি স্থাপন করেছিলেন— বিদেশিরা 'সিন্ধু' থেকে 'হিন্দু' কথাটা উচ্চারণ করতেন— গ্রিক্ 'India' ও আরবি ও পার্সি ভাষায় এটা হয়েছে 'Hind' বা হিন্দু (প্রাচীন ভারত, পৃ. ২)। অনুরূপভাবে ড. ঊষারঞ্জন চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন— একটাই জাতিসত্তা গঠিত হয়েছিল সিন্ধুর তীরে— তারই নাম 'হিন্দু'। তাই ভারতের অন্য নাম 'হিন্দুস্থান', পর্বতের নাম 'হিন্দুকুশ', রাষ্ট্রীয় চেতনার নাম 'জয় হিন্দ'— (প্রসঙ্গ গণতন্ত্র, রাজনীতি ও ধর্ম, পৃ. ৩৯)। এই হিন্দু-ঐতিহ্য ও ধর্মই শিখিয়েছে— 'বুসধৈব কুটুম্বকম্' (সবাই আত্মীয়)। 'সর্বেব ভবন্তু সুখীনঃ/সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ (সবাই সুস্থ থাকুন)/'সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু.../(সবাই ভালটা দেখুন)/মা কশ্চিৎ দুঃখ মাপ্নুয়াৎ— এক্ষেত্রে 'সবাই' কথাটা শুধু মানুষকে নয়— জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গকেও বোঝানো হয়েছে।

এর মধ্যে ধর্মবিদ্বেষ কোথায়? বিজেপি কাউকে 'হিন্দু' হতে বলেছে? বলেছে— 'ভারতীয়' হওয়ার জন্য--- একটা অখণ্ড ভারত-বোধে উদ্দীপ্ত হওয়ার জন্য। কিন্তু গোঁড়া মুসলমানরা তাঁদের পৃথক সত্তা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে চেয়েছেন ঐকান্তিক ভাবে। ড. জে সি জোহারী মন্তব্য করেছেন, 'The orthadax school of the Muslim Communiy makes out a pascrobus case against nationalism, Secularism and democrasy— (ইন্ডিয়া পলিটিক্স, পৃ. ২৮০)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদের শিখিয়েছেন— সব ধর্ম একই দিকে নিয়ে যায়— 'যত মত, তত পথ। আর স্বামীজী এক্ষেত্রে শেষ ভাষণে বলেছেন--- দরকার প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা; বিভেদ নয়— ঐক্য।

কিন্তু পূর্বোক্ত সম্প্রদায় চেয়েছে পৃথক অস্তিত্ব, বাড়তি সুযোগ। তাই সংবিধানের ৪৪ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রকে সবার জন্য অভিন্ন দেওয়ানি আইন রচনার নির্দেশ দিলেও তাঁদের বাধায় সেটা আজও হয়নি। আমেদ খাঁ বনাম শাহবানো মামলায় (১৯৮৫) প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় এটাকে 'matter of ragret' বলে মন্তব্য করেছিলেন। আর সেই বছরই ডিয়েঙ্গভে বনাম ডোয়ারার মামলায় সর্বোচ্চ আদালত সরকারকে কাজটা সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। সরলা মুদ্গল বনাম ভারত-সরকারের মামলায় (১৯৯৫) বিচারপতি কুলদীপ সিং লিখেছিলেন--- 'when more than 80% of the citizens have already been brought under the personal law, there is no reason whatsover to keep in abayance away more the introduction of uniform civil code।

কিন্তু এখনও সেটা করা যায়নি এই ধর্মাবলম্বীদের বাধার ফলে। বরং ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধী আদালতের রায়কে অতিক্রম করার জন্য নতুন আইন রচনা করেছিলেন। অথচ পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইরাক, ইরান, মিশর ইত্যাদি মুসলমান অধ্যুষিত দেশ শরিয়তি আইন সংশোধন করেছে, রচিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় বিধি। কিন্তু এই দেশের গোঁড়া মুসলমানরা বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, স্ত্রী-শিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে চেয়েছেন শরিয়তি আইন। সম্প্রতি 'পার্সনাল ল বোর্ড' জানিয়েছে--- সেই আইনের বৈধতা বিচারের অধিকার সুপ্রিম কোর্টেরও নেই— বরং এর জন্য সংবিধান সংশোধন করা দরকার।

এই ব্যাপারে প্রগতিশীলরা নীরব কেন? শুধু তাই নয়। সম্প্রতি সিউড়িতে চৈতন্যদেবের জয়ন্তীতে মিছিলকে পুলিশ মাদ্রাসা রোড দিয়ে যেতে দেয়নি। তেমনি, শিবরাত্রিতে ময়ূরেশ্বরে মন্দির ভাঙা হয়েছে। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে রেকর্ডে আছে এই পর্যন্ত ৩৯৯৯টা মন্দির ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক ড. মাখনলাল রায়চৌধুরী (ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয়, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯) এবং কে. এস. লাল (মুসলিম স্টেট ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ৬৫৬) জানিয়েছেন, অযোধ্যার রামমন্দির ভেঙে 'বাবরি মসজিদ' করা হয়েছিল বাবরের আমলে। অথচ তারই ওপরের অংশ কয়েক বছর আগে শত শত রামভক্ত দ্বারা ভাঙা হলে দেশব্যাপী ধিক্কার দেওয়া হয়েছিল—বিজেপি-শাসিত চারটে রাজ্যকে আনা হয়েছিল রাষ্ট্রপতি শাসনের আওতায়।

আচার্য নন্দলাল বসু মাতা সরস্বতীর দুটো ছবি এঁকেছেন— দেখে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে মন আপ্লুত হয়। কিন্তু মক্‌বুল ফিদা হুসেন মাতা-সরস্বতীর নগ্ন মূর্তি আঁকলেন কেন? কেনই বা তাঁর আঁকা একটা ছবিতে দেখলাম মাতা-সীতাকে লেজে বসিয়ে হনুমান যাচ্ছেন— তাঁর লেজ (লিখতে লজ্জা করছে) সীতাদেবীর গোপনাঙ্গ ছুঁয়েছে। প্রগতিশীলরা কখনও এর প্রতিবাদ করেছেন? কেন তসলিমা নাসরিনকে রাতারাতি বিতাড়িত করতে হয়েছে? বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক আরলন্ড টয়েনবীর একটা লেখা নিয়ে কেন একটা বড় পত্রিকা পড়ানো হয়েছিল? দমদমের একটা পৌরসভা রামনবমী অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়ায় কেন হাইকোর্ট থেকে তার অনুমতি নিতে হলো?

এই সব কথা কিন্তু ভেবে দেখা এবার দরকার।

খাওয়াটা ব্যক্তিগত রুচি ও ইচ্ছের ব্যাপার। সুতরাং গো-মাংস যে-কেউ খেতে পারেন। কিন্তু তার জন্য কেন প্রচার করতে হলো— ঋষিরাও এটা খেতেন এবং আমাদের শাস্ত্র-এর অনুমতি দিয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ড. সীতানাথ গোস্বামী লিখেছেন এই সব কথা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপূর্ণ ও ভ্রান্ত— শাস্ত্র বরং সেটা নিষিদ্ধ করেছে--- (স্বস্তিকা, ৩০.১১.১৫)।

আমাদের এই পাণ্ডিত্য প্রকাশ কেন? প্রকাশ্যে গো-মাংস খেয়ে তারা প্রতিবাদ করেছে কার বিরুদ্ধে?

প্রশ্ন অনেক রয়ে গেল।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক)

হিন্দুত্বের অশ্বমেধ-ঘোড়ায় সওয়ার মিশন নিউ ইন্ডিয়া

সাধন কুমার পাল

স্পষ্টতই ভারতবর্ষ এখন দুই শিবিরে বিভক্ত। হিন্দুত্ববাদী ও 'মেকলে-মার্কস-নেহরুবাদী' অর্থাৎ সেকুলারবাদী শিবির। স্বাধীনতা- পূর্ব সময় থেকে এদেশের সর্বক্ষেত্রে সেকুলারবাদীদের আধিপত্য ছিল প্রশ্নাতীত। রাজনৈতিক যুদ্ধে এতদিন আঞ্চলিক ভাবে বিভিন্ন ঘাঁটি আগলে রাখলেও ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয়ের পরই হিন্দুত্ববাদীরা তাদের অশ্বমেধের ঘোড়া ছোটানো শুরু করেছে। দিল্লি ও বিহার বিধানসভা নির্বাচনে সেকুলারবাদীরা এই ঘোড়াকে সাময়িক ভাবে আটকে দিতে পারলেও ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের সেমিফাইনাল হিসেবে চিহ্নিত উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব, গোয়া, মণিপুর এই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বলছে হিন্দুত্বের বিজয়পতাকাবাহী অশ্বমেধের ঘোড়া এখন অপ্রতিরোধ্য।

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী পদে 'হিন্দুত্ববাদের পোস্টার বয়' নরেন্দ্র মোদীর শপথগ্রহণ ছিল স্বাধীনোত্তর ভারতে গড়ে উঠা 'মেকলে- মার্কস-নেহরু মডেলের' উপর এক বিরাট আঘাত। অসহিষ্ণু অস্থিরতার স্রষ্টা এই সেকুলার গ্যাংয়ের প্রত্যাঘাতের ক্ষমতাও যে কম নয় বিহার বিধানসভা নির্বাচনের সময় মানুষ তা দেখেছে। তবে এবারের আঘাত আরো বড়। উত্তরপ্রদেশের মতো বহু ধর্ম-বর্ণ- অধ্যুষিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে গেরুয়াধারী 'কট্টর হিন্দুত্ববাদের পোস্টার বয়' যোগী আদিত্যনাথের শপথগ্রহণের পর থেকে গেল গেল আওয়াজ উঠেছে এই সেকুলার গ্যাং-এর অন্দরমহলে। আর শেষ রক্ষা হলো না! হিন্দুত্ববাদীদের হাতেই চলে গেলো দেশটা! উত্তরপ্রদেশে বিজেপির এই জয় 'মেকলে-মার্কস-নেহরুবাদীদের' শিরে বজ্রাঘাত বলা যেতে পারে।

গণতন্ত্রে মতাদর্শের লড়াই হতেই পারে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এতদিন সেকুলারবাদীদের আধিপত্য বিস্তারের কোনো সীমা পরিসীমা ছিল না। অস্তিত্ব বিলোপ হওয়ার মতো প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও হিন্দুত্ববাদীরা সর্বংসহা হয়ে টিকে ছিল। কারণ ধৈর্য, সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতা হিন্দুত্বের গোড়ার কথা। কিন্তু অসহিষ্ণুতার অযৌক্তিক দৃষ্টান্ত টেনে পুরস্কারত্যাগীদের অসহিষ্ণু আচরণ, যাদবপুর ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের একাংশের ভারতবিরোধী হুঙ্কার, এদের সমর্থনে দাঁড়ানো রাজনীতিবিদের আচরণ, তথাকথিত কবি শ্রীজাত'র মতো বুদ্ধিজীবীদের ঘৃণার উদ্রেককারী সৃজনশীলতা দেখে এই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে গণতান্ত্রিক পথে ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতি এই সেকুলার গ্যাং এতটা অসহিষ্ণু কেন?

ইতিহাস বলছে স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতবর্ষে চতুর ব্রিটিশ শাসকদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির গর্ভেই বর্তমান সেকুলার রাজনীতির জন্ম। শাসক ইংরেজ স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্বল করতে মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যালঘু সেন্টিমেন্ট ও ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে কিছু মানুষকে ব্যবহার করে এদেশের মূলস্রোতের মধ্যেই 'ভিন্ন স্রোত' তৈরির প্রয়াস চালিয়েছিলেন।

পরবর্তী সময়ে শাসক ইংরেজের অনুকম্পা লোভী মার্কস ও মেকলের মানসপুত্রদের বদান্যতায় 'মুসলমানদের পৃথক স্বার্থ নামক বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবনা', ক্ষমতার লোভ, রাজনীতিকে পেশা হিসেবে নেওয়ার প্রবণতার মতো সংকীর্ণতা স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলস্রোতে জায়গা করে নেয়। ফলস্বরূপ মূর্তিমান বিচ্ছিন্নতাবাদী মহম্মদ আলি জিন্না এদেশের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠেন। যার পরিণাম রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, দেশভাগ।

জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন ইংরেজিয়ানা চাই, ইংরেজ নয়। মেকলে চাইতেন এই দেশে এমন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠুক যাতে শিক্ষার্থীর শরীরটা হবে ভারতীয় কিন্তু মনন-মানসিকতায় হবে ইংরেজ। মার্কসবাদীরা চাইতেন এই দেশের মানুষের মনন-মানসিকতা চীন কিংবা রাশিয়ার অনুকরণে গড়ে উঠুক। শাসক ইংরেজের মতো এই গ্যাংয়ের কাছেও ভারতীয় ভাব, দর্শন ও চিন্তা মানেই অসভ্য আদিম বর্বর যুগে আটকে থাকা এক জীবনদর্শন। ফলে 'ভারতীয়ত্ব অর্থাৎ হিন্দুত্বের অন্ধকার' থেকে টেনে তুলে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রে ভারতকে ইউরোপ, চীন বা রাশিয়ার আলোকে আলোকিত করাই ছিল এদের এক মাত্র ধ্যানজ্ঞান। যাদবপুর কিংবা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতকে টুকরো টুকরো করার দাবিতে মিছিলকারী দেশদ্রোহী ছাত্রদের সমর্থনে এগিয়ে আসা থেকে এটা স্পষ্ট করে বলা যায় এই গ্যাংয়ের কাছে ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে দেশপ্রেম জাতীয়তাবাদ এই শব্দগুলি আধুনিকতা বিরোধী, প্রগতি বিরোধী, পিছিয়ে পড়ার প্রতীক, বিষতুল্য বাজে কথা।

স্বাভাবিক ভাবেই এই গ্যাংয়ের কাছে স্বাধীনতার লড়াই ছিল আজকের দিনের সিপিএম-তৃণমূলের লড়াইয়ের মতো নির্ভেজাল ক্ষমতা দখলের লড়াই। সেই জন্যই ১৯৪৭ সালে অখণ্ড ভারতের বুকে ছুরি চালিয়ে দেশভাগ করে ইংরেজের কাছ থেকে খণ্ডিত অংশের স্বাধীনতা বুঝে নিতে শাসক ইংরেজের উচ্ছিষ্টভোগীদের কোনো সমস্যাই হয়নি। দেশের শাসন ক্ষমতা হাতে

নিয়েই জওহরলাল নেহরু গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডের সুযোগ নিয়ে ১৯২৫ সালে ডাঃ হেডগেওয়ার কর্তৃক প্রজ্বলিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নামক জাতীয়তাবাদের প্রদীপটিকে চিরতরে নিভিয়ে দেওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস করেছিলেন। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে ভারতের নিজস্বতা সরিয়ে বিভিন্ন বিদেশি মডেল ধার করে শুরু হয় উন্নয়নের পরিকল্পনা। ফলস্বরূপ স্বাধীনতার সাত দশক পরেও ভারত বিশ্বের উন্নত দেশগুলির অনুকম্পাকাঙ্ক্ষী দুর্বল উন্নয়নশীল দেশের সারিতে দাঁড়িয়ে। স্বাভাবিক ভাবেই এই সেকুলার রাজনীতির অসারতা, সঙ্কীর্ণতা যত উন্মোচিত হচ্ছে ততই জনপ্রিয় হচ্ছে হিন্দুত্ব। কংগ্রেস-মুক্ত যে ভারতের স্বপ্ন হিন্দুত্ববাদীরা দেখছেন তা যে আসলে বিকৃত সেকুলারিজম্-মুক্ত ভারতের স্বপ্ন— এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ইসলাম খ্রিস্টান বৌদ্ধ জৈন বৈষ্ণব শৈব শাক্তের মতো হিন্দুত্ব কোনো উপাসনা পদ্ধতির নাম নয়। এটি একটি জীবন পদ্ধতি। হিন্দুত্বে ভারতীয়ত্বে কোনো তফাত নেই। এই জীবন পদ্ধতির জন্য ভারতবর্ষ পৃথিবীর আর দশটা দেশ থেকে ভিন্ন। বহুত্ববাদের সঙ্গে, আধুনিকতার সঙ্গে হিন্দুত্বের কোনো বিরোধ নেই। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে যোগী আদিত্যনাথের নির্বাচন সেকুলারবাদীদের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন ব্যাপার হলেও জাতপাত ও বিষয় অনুরাগের ঊর্ধ্বে থাকা একজন মানুষই উত্তরপ্রদেশের মতো বহু ধর্ম-বর্ণ-অধ্যুষিত ভয়ঙ্কর দুর্নীতিগ্রস্ত একটি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য সবচেয়ে যোগ্য এটা বুঝতে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নেই।

সঙ্ঘের যে সমস্ত স্বয়ংসেবক রাজনীতি করছেন তাদের কাছে নির্বাচনে জয় লক্ষ্যে পৌঁছনোর সাধন (উপায়) মাত্র। নির্বাচনোত্তর বিজয়োৎসবগুলিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণে সে কথাই ঘুরে ফিরে আসছে। মোদীজী ১৪-র লোকসভার ফলাফলের পরও বলেছিলেন, এবার পাঁচ রাজ্যের ফলাফলের পরও বললেন, এই বিজয় কয়েক প্রজন্ম ধরে অগণিত মানুষের জীবন-যৌবন উৎসর্গ করা সাধনার ফল। তিনি আরো বলেছেন যত বড়ই হোক না কেন ফলন্ত গাছ ঝুঁকে থাকে। নির্বাচনী সাফল্যে টইটম্বুর ভারতীয় জনতা পার্টিরও এখন ঝুঁকে থাকার সময়।

এই বিরাট জয় দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি কী করবে এবং কীভাবে করবে এই নিয়ে দলের গাইড ও ফিলসফারদের মধ্যে যে-কোনোরকম সংশয় বা দিশাহীনতা নেই সেই বিষয়টিও স্পষ্ট উঠে এসেছে প্রধানমন্ত্রীর অশোকা রোডে বিজেপির প্রধান কার্যালয়ে দেওয়া ভাষণে। তিনি বলেছেন, এবার একাত্ম মানবদর্শনের প্রবক্তা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ। এই জন্মশতবর্ষে দীনদয়ালজীর কর্মভূমি উত্তরপ্রদেশে এত বড় জয় বিশেষ অর্থবহ। এই জয়কে হাতিয়ার করেই যে ভারতীয় জনতা পার্টি একাত্ম মানবদর্শনের তত্ত্বকে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে চায় এবং এই দর্শনকে ভিত্তি করেই যে নতুন ভারত অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভারত, গান্ধীজীর স্বপ্নের রামরাজ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসা ভারত গড়তে চায়।

কীভাবে গড়ে উঠবে সেই ভারত তার রোডম্যাপও উঠে এসেছে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে। তিনি বলেছেন সংখ্যালঘু, জাতপাত, সংরক্ষণের কিংবা কোনো সাময়িক ইমোশনাল ইস্যু কিংবা সস্তায় কিছু পাওয়ার লোভে এবার মানুষ ভোট দেয়নি। নির্বাচনকেন্দ্রিক প্রতিশ্রুতির ঝুলি দেখে নয় মানুষ এবার ভোট দিয়েছে সর্বাত্মক উন্নয়নের মতো কঠিন ইস্যুকে সামনে রেখে। এই ধরনের ইস্যুর ভিত্তিতে জয়ের মধ্যে তিনি ৩৫ বছর বয়সের নীচে দেশের ৬৫ শতাংশ যুবকের স্বপ্নের নিউ ইন্ডিয়া, জাগরূক মাতৃশক্তির নিউ ইন্ডিয়াকে দেখতে পেয়েছেন। এটা এমন নিউ ইন্ডিয়া যেখানে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম মানুষেরা সাহায্যের বদলে নিজের শক্তি ও সামর্থে যাতে কিছু করতে পারে তার জন্য সুযোগ চায়। দেশের গরিব মানুষেরা যদি নিজের সামর্থ্য উজাড় করে দেওয়ার মতো সুযোগ পায় তাহলেই উন্নয়নের ঘোড়াকে দ্রুত ছোটানো সম্ভব। বিভিন্ন দায়দায়িত্ব, নানা বিধিনিষেধ থেকে শুরু করে আর্থিক বোঝায় মধ্যবিত্তরাই বেশি ভারাক্রান্ত থাকে। দেশের দরিদ্র মানুষ যদি নিজের বোঝা বহনের মতো শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করতে পারে তাহলেই মধ্যবিত্তদের বোঝা কমিয়ে আনা সম্ভব। কারো সাহায্য ছাড়াই এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বোঝা কমিয়ে আনলে তারা আরো দ্রুত এগিয়ে যেতে পারবেন। গরিবের সামর্থ্য ও মধ্যবিত্তের স্বপ্ন যদি মিলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এই ভারতকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া থেকে কেউ আটকাতে পারবে না। এটাই নিউ ইন্ডিয়ার অর্থনীতির নতুন রূপরেখা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২২ সালে ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পুর্তি হচ্ছে। হাতে আর পাঁচ বছর। এই পাঁচ বছর একশো ত্রিশ কোটি ভারতবাসী, বিভিন্ন সংগঠন, যে যেখানে কাজ করছে সেই কর্মস্থলে যদি একটি নতুন সংকল্প নিয়ে তা ২০২২ সালের মধ্যে পূরণের জন্য সচেষ্ট হয় তাহলে ভারতবর্ষের পিছিয়ে থাকার কোনো প্রশ্নই নেই। এই কাজ সরকারের একার কাজ নয়। এতে ব্যক্তি হিসেবে সব নাগরিককে, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় হতে হবে। পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল দেশের সমস্ত মানুষকে জুড়ে দিয়ে উন্নয়নকে এক আন্দোলনে পরিণত করার সুযোগ এনে দিয়েছে।

গত ২৭ মার্চ ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন গান্ধীজীর পথ ধরে সেই স্বপ্নের ভিতটি তিনি গড়তে চান। ঘুষ ও কালোটাকার বিরুদ্ধে লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি আরও বেশি ডিজিটাল লেনদেনের আহ্বান জানান। খাবারের অপচয় বন্ধ করা, ব্যক্তিগত ভাবে সপ্তাহে একদিন পেট্রল-ডিজেল ব্যবহার বন্ধ করা, আশপাশের গরিবদের সাহায্য করা, মানুষের হতাশা কাটানোর প্রয়াসের মধ্য দিয়েই তৈরি হবে ‘নতুন ভারত’। সব দেশবাসী নিজের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করলেই তৈরি হবে ‘নতুন ভারত’। একদিকে ‘সৃজন’ আর এক দিকে ‘সংঘর্ষ’ এটিই হবে নতুন ভারতের কর্মকৌশল। ■

শেয়ার বাজারের কর্মসূচি

শেখর সেনগুপ্ত

স্টকমার্কেটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন, এরকম লোকের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। চিটফান্ডগুলির চিটিংবাজি, ডিপোজিটের ওপর লভ্য সুদের হার ক্রমেই ধেয়ে চলেছে নীচের দিকে— বিনিয়োগকারীদের কাছে এই আবহ আদৌ সুখকর নয়। অনেকটা বাধ্য হয়েই তাঁর বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে বেশি বেশি করে বেছে নিচ্ছেন শেয়ারবাজার, মিউচুয়াল ফান্ড, সরকারি বন্ড ইত্যাদিকে। শেয়ারবাজার বা স্টকমাকের্টের চালচিত্র অনেকের কাছেই যে ধোঁয়াটে, আমি তা লোকদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারি। এর ইতিহাসও নির্মাণের পশ্চাৎপটটি কিন্তু বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। যত দিন যাবে, এই মার্কেটের আকর্ষণ যে ততই বাড়বে, তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ইচ্ছে হলেই আপনি ছোটবড় হরেক কিসিমের কোম্পানিগুলির ঠিকুজি নিজের হেপাজতে নিয়ে আসতে পারেন। কোনো কোম্পানির জয়যাত্রা অব্যাহত, কোনো নবীন কোম্পানির ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ, আবার কোনো কোম্পানির এমন ভগ্নদশা যে তার অভ্যন্তরে ঢুকতে ভয় হয়— এ সমস্ত যাচাই করেই আপনি আপনার সিদ্ধান্তটি নিতে পারছেন।

আগেকার দিনে শেয়ার বাজারের কোনো আলাদা পরিচিতি ছিল না। খুব ডাকসাইটে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কারোর শেয়ারে টাকা ঢালাটা ছিল প্রায় অলীক দৃষ্টান্ত। বড় কোম্পানিও তার শেয়ার বা অংশীদারত্ব বেচতে গিয়ে হতাশ হয়েছে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বিশিষ্ট ধনীদের বাড়িতে বাড়িতে উর্দিধারী কর্মচারী পাঠিয়ে শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাব রাখতেন। পরে একটা বিশেষ জায়গা ঠিক করে সেখানে টাঙানো হতে থাকে শেয়ারপত্র বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন। এইভাবে নিখরচায় বিজ্ঞাপন দিতে দিতে সেই জায়গাটার মাহাত্ম্যই গেল বদলে। লোকে তখন জানলো, শেয়ার বেচতে গেলে অথবা কিনতে গেলে ওই জায়গাটিতে হাজির হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ। সেই বিশেষস্থানটি কোথায়, জানেন? আজকের নগর কলকাতার 'ক্লাইভ রো'! সেই কালের সবচেয়ে শক্তপোক্ত ও বিশ্বস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান 'ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া' (১৯৫৭ সাল থেকে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)-র শেয়ার বেচাকেনার কেন্দ্র হয়ে ওঠায় ক্লাইভ রোর বিশেষ পরিচিতি একলপ্তে অনেকখানি ব্যাপ্তি পেয়ে যায়। এ ভাবেই ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে সংগঠিত হলো আধুনিক কলকাতার স্টক এক্সচেঞ্জ।

অনেক বছর হলো সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ ধীরে ধীরে তার ব্যস্ততা ও গরিমা হারিয়েছে। এখন এমন অবস্থা যেন কুয়োপাড়ে দাঁড়িয়ে জলের তলানি দর্শন। এখন শেয়ারবাজার বলতে আমরা চিহ্নিত করে থাকি ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জকেই। শেয়ার বেচা-কেনায় এসে গিয়েছে যুগপৎ স্বচ্ছতা ও দ্রুততা। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিটি শেয়ারের দাম কখন উঠছে, কখন পড়ছে— সবই আপনার ব্রোকার তাঁর বিশেষ কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। ন্যাশনাল স্টকএক্সচেঞ্জের দরিয়ায় আপনি যে শেয়ার বিক্রি করতে চান, তার বিবরণী তথা অন্যবিধ তথ্যাদি কম্পিউটার স্ক্রিনে তুলে ধরবেন আপনারই ব্রোকার। ফলে সরাসরি তা সম্ভাব্য ক্রেতাদের গোচরে চলে আসবে। এই ক্রেতা-বিক্রেতারা ছড়িয়ে আছেন আসমুদ্র হিমাচল। কোনো দরকার নেই ক্রেতা-বিক্রেতার নাম-ঠিকানা জানাবার। কোনো সন্দিহান ব্যক্তির পক্ষেও সহজে ক্রেতা-বিক্রেতার নাম জানা প্রায় অসম্ভব। কারণ (এনএসই) ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ আপনার শেয়ার নিঃশব্দে বিক্রি করে দেবে ওই যন্ত্রের মাধ্যমেই। কম্পিউটারের মাধ্যমে এ রকম অসংখ্য তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার প্রতি মুহূর্তে কেনাবেচা হচ্ছে— যে কেনাবেচার দরুণ সেনসেক্স কখনও ইতিবাচক, কখনও নেতিবাচক। সেই ক্রয়-বিক্রয়ের মাহেন্দ্রক্ষণটিতে আপনার সিদ্ধান্ত এবং কিছুটা ভাগ্য যদি সঠিক ও অনুকূল হয়, আপনি নিজেকে লক্ষ্মীমন্ত করে তুলতে পারবেন। কম্পিউটার মারফত যে বিপুল ক্রয়-বিক্রয়, প্রতি মুহূর্তের উল্লাস কিংবা বিষাদ ও তজ্জনিত পরিস্থিতিকে সরল ভাষায় সারা দেশকে অবহিত করা--- সবটাই প্রতিদিন ঘটে থাকে একটা নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে। দৈনিক সেই সময়ের সূচনা সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটে এবং সমাপ্তি ঠিক দুপুর সাড়ে তিনটায়। এটা কিন্তু সপ্তাহের সাতদিন ধরেই চলে না। চালু থাকে পাঁচ দিন--- সোম থেকে শুক্র। এছাড়া তালিকাভুক্ত অথবা আকস্মিক কোনো কারণে ঘোষিত ছুটির দিনেও শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ থাকে।

আজ এই অবধিই থাক। পাঠক অপেক্ষা করুন। আপনার আর্থিক স্বাস্থ্যের পক্ষে দিশাদায়ী শেয়ার সমেত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা পোষণ করছি।

(লেখক ব্যাঙ্কের প্রাক্তন প্রশিক্ষক)

কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে গো-মন্ত্রালয়ের প্রয়োজন

কৃষ্ণেন্দু ব্যানার্জী

গো-সম্পদ মানব-সভ্যতার পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ বলা যায় কারণ একই ছাদের নীচে প্রভূত উপকার একমাত্র গোরু ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর কাছ থেকে পাওয়া যায় না। এই প্রাণীটি আমাদের সংস্কৃতি এবং পরম্পরার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলা হয়। গো-প্রজাতি আমাদের ছাড়াই বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু আমরা এদের ছাড়া বাঁচতে পারি না। এছাড়াও সমগ্র পৃথিবীর প্রয়োজনে গো-প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। কারণ গোরুই হচ্ছে জৈব-চক্রকে সজীব রাখার অন্যতম বার্তাবহ এবং মানবসমাজে সমস্ত জীবিত প্রাণীই কোনো না কোনো ভাবে এর উপর নির্ভরশীল। এর থেকে জাত এবং উপজাত বস্তুগুলি মানুষের কাছে অমৃত-স্বরূপ। এই প্রাণীটি দেশের কৃষি-ব্যবস্থার মেরুদণ্ড বলা যায়। বলদ জমিতে হাল-লাঙ্গল টেনে কৃষিকার্যে সহায়তা করা এছাড়া ভারবাহী পশু হিসাবে গাড়ি টেনে পেট্রলজাত পণ্যের সাশ্রয় করে এবং বাতাস বিশুদ্ধ রাখে। কিন্তু এই পেট্রলচালিত যানবাহনের উদ্ভবের ফলে গোরুর গাড়ির প্রয়োজন ফুরিয়েছে তৎসহ তাদের অর্থনৈতিকভাবে বিশেষ মর্যাদার স্থান ছিল সেখান থেকে সে বিচ্যুত হয়ে গেছে এবং কৃষকগণ তাদের বিক্রি করে দিচ্ছে।

এই বিশেষ অর্থনৈতিক অবস্থার পুনরুদ্ধার এবং সম্পূর্ণ গোরক্ষাকে বাস্তবায়ন করতে হলে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যস্তরে গো-মন্ত্রালয়ের অবশ্য প্রয়োজন। যার মাধ্যমে গোপালকগণ বিভিন্ন ভরতুকি লাভ করবেন, প্রয়োজনীয় পরামর্শ, প্রশিক্ষণ লাভ করবেন। এছাড়াও বিভিন্ন দ্রব্য, উপজাত দ্রব্যসমূহ বিক্রয় করা যাবে যাতে গো-প্রজাতি এবং গোপালক উভয়ই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদনও জানানো হয়েছে।

গো-মন্ত্রালয় তৈরি এবং উন্নয়নের ব্যাপারে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য কারণ রয়েছে। শুধুমাত্র গোশালা, বেসরকারি সংস্থা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সামগ্রিকভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা গো-ভিত্তিক কৃষি এবং বাণিজ্যের বাস্তবায়ণ সম্ভব নয়, কারণ এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন কার্যকরী মূলধন। প্রতিটি ব্লক, মহকুমায় প্রয়োজনীয়

পরিকাঠামো যা সমগ্র দেশে জালিকার ন্যায় বিস্তৃত হয়ে থাকবে, এসবের জন্য বহু কোটি টাকা মূলধনের দরকার যা উপরিউক্ত সংস্থাগুলির সাধ্যের অতীত।

আগেই বলা হয়েছে যে, গো-পরিবার জৈব-চক্র বজায় রাখার এক উপযুক্ত বার্তাবহ, যার ফলে আমাদের এই পৃথিবী সজীব-সচল রয়েছে। সত্যি কথা হলো, গো-পরিবারকে জৈব-চক্র সক্রিয় রাখার 'রাজা' বলা যায়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই গোরু ভারতীয় কৃষির মেরুদণ্ড। গোময় থেকে উৎপাদিত সার এবং বলদের দ্বারা কৃষিক্ষেত্র কর্ষণ কৃষিব্যবস্থার ক্ষেত্রে সবচাইতে প্রয়োজনীয় এবং উপকারী হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে এবং অন্য কোনো পশু এই ব্যাপারে এদের সমকক্ষ হতে সক্ষম নয়। বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণিত যে কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতিই দেশের বৃহৎ অর্থনীতি।

গো-দুগ্ধকে বলা হয় সবচাইতে আদর্শ পানীয় যা সব বয়সের মানুষই ব্যবহার করতে পারে। মাতৃ-দুগ্ধের পর গো-দুগ্ধই মানুষের সবচাইতে প্রয়োজনীয় পরিপূরক আহার। উচ্চহারে ঔষধীয়গুণ থাকার ফলে গোময় এবং গোমূত্রকে মানুষের পক্ষে 'অমৃত' বলা হয়। অনেক আয়ুর্বেদিয় ওষুধ যেমন 'পঞ্চগব্য' এবং ক্যানসারসহ অন্য ব্যাধি নিরাময়ের ওষুধ এর থেকে উৎপাদন হয়, যেক্ষেত্রে পৃথিবীর আর কোনো পশুপ্রাণী গোরুর সমকক্ষ হতে পারবে না। মনে রাখতে হবে যে, গো-দুগ্ধ স্বয়ংই এক ওষুধ যা নিয়মিত পান করলে অনেক রোগ ঠেকিয়ে রাখা যাবে। দৈহিক গঠনের কারণে বলদই পৃথিবীর একমাত্র ভারবাহী পশু যা সুচারুভাবে কৃষিক্ষেত্র কর্ষণের উপযুক্ত।

স্বাধীনতা-পূর্ব ব্রিটিশ আমলে গোরক্ষা বিষয়টি ভারতীয়দের কাছে অনুভূত হয়। এর আগে ৮০০ বছর গোমাংস ভক্ষণের বিষয়টি মুসলমান শাসিত ভারতবর্ষে বা তার পূর্ব যুগেও প্রচলিত ছিল না; সুতরাং গো-রক্ষা বিষয়টির প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। মুসলমান শাসনেও গো-হত্যা নিষিদ্ধ ছিল। কারণ গোরু বা ষাঁড় অক্ষম হয়ে পড়লে তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো অরণ্যে ছেড়ে দেওয়া হোত। আয়ুষ্কালের বাকি সময়টুকু তারা সেখানেই কাটাতো। গোমাংস ভক্ষণের সংস্কৃতি ব্রিটিশরাই ভারতবর্ষে আমদানি করে, যার কারণে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭ সালে সংঘঠিত হয়, সেখানে কার্তুজে গোরু এবং শূকরের চর্বি ব্যবহার করবার কথা শোনা যায়। হিন্দু এবং মুসলমান সিপাহিদের মধ্যে ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে এবং সিপাহি মঙ্গল পাণ্ডে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব

সন্ত সুরদাস জয়ন্তী অনুষ্ঠান
৩০ এপ্রিল ২০১৭, বিকেল ৫টা।
স্থান : কেশব ভবন
৯এ, অভেদানন্দ রোড,
কলকাতা-৬

দেন। এইভাবে, ঘটনাক্রমে ব্রিটিশরা ভারতীয় খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে গোমাংস ভক্ষণের দূষণ সৃষ্টি করে।

ব্রিটিশরা শুধু ভারতীয়দের ধর্মান্তরই করেনি, ভারতবর্ষের হিন্দুদের একাংশ এবং মুসলমানদের মধ্যে গোমাংসকে খাদ্য-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্ররোচিত করে তাদের খাধ্যাভ্যাসকে বিকৃত করে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য এবং তার দ্বারা চালিত যন্ত্রপাতি এবং যানবাহনের প্রচলনের ফলে গো-সংস্কৃতি বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়। এর ফলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে গোজাত এবং উপজাত দ্রব্যসমূহের অর্থনৈতিক মর্যাদার হানি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, মাত্রাতিরিক্ত এলপিজি-র ব্যবহার এবং সমভাবে গোবর গ্যাসের অ-বাণিজ্যিকরণ। গোময়ের উৎপাদন এবং জৈবসারের ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করা হয়। এই একই জনসাধারণ গোমূত্রের বহুবিধ ব্যবহার এবং উপযোগিতা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়। এইভাবে সমস্ত বিষয়গুলি একত্র করলে এটাই বলা যায় যে গোরু এবং তার থেকে সঞ্জাত বিভিন্ন দ্রব্যসমূহের ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস করা হয়। এর ফলে গোপালকগণ অক্ষম গোরুগুলিকে বিক্রি করতে লাগল এবং একই সঙ্গে প্রাণীগুলির সদুপযোগ করতেও ব্যর্থ হলো। এইরকম এক ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে এটি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে প্রাণীগুলির জীবিতকালের মধ্যে তাদেরকে যথাযথভাবে রক্ষণ করা যাবে কিনা সন্দেহ।

এরকম এক অবস্থায় গোরুগুলি আস্তে আস্তে বিক্রি হয়ে যাবে এবং লোভনীয় মূল্যে তাদের মাংস বিদেশে রপ্তানি হবে। সুতরাং গোপালকগণকে দোষারোপ করে কোনো লাভ নেই আর সরকারকে গোমাংস রপ্তানি বন্ধ করতে বললেও কিছু হবে না। কেউ কি এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে যে যদি গোমাংস রপ্তানি বন্ধ করেও দেওয়া হয় তাহলে এই গো-প্রজাতিকে কীভাবে অর্থনৈতিকভাবে জীবিত রাখা যাবে? সাধারণভাবে ১৮ বছর বয়সে গোরু দুগ্ধদান বন্ধ করে। তারপর আরও ৭/৮ বছর অর্থাৎ ২৫ বছর অবধি জীবিত থাকে। তাহলে গোপালকগণ দুগ্ধদান বন্ধ করবার পর এই ৭/৮ বছর প্রাণীগুলিকে কীভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে? বাইরে ছেড়ে দেওয়ার চাইতে সাধারণভাবে তারা এই প্রাণীগুলিকে বিক্রি করে কিছু লাভ করতে চাইবে। প্রকৃত ‘গো-রক্ষা’র তাহলে কী হলো? এমন একটা উপায় বের করতে হবে যাতে গোপালকগণ গোরুগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে জীবিত রাখতে পারে। শুধুমাত্র গোশালা বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যারা কর ছাড়ের সুযোগসহ দান গ্রহণ করে সাধারণ বাণিজ্যিক সংস্থার মতো পরিচালিত হয়, সেই তাদের দ্বারা কখনোই সম্ভব নয়।

এখানে এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্নটা উঠে আসে যে গোপালকগণ গোময় বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করে তার থেকে ন্যূনতম লাভ উঠাতে পারে কিনা। কিন্তু তার সঙ্গে নিশ্চিতভাবে এই প্রশ্নটাও উঠে আসে যে প্রয়োজনীয় বিপনন কেন্দ্র ছাড়া এই প্রতিযোগিতার বাজারে কীভাবে তা বিক্রি হবে? কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের গতি কী হবে? আবার এই প্রকল্প শুধুমাত্র সরকারি সংস্থার দ্বারা অধিগ্রহণ করা উচিত, কোনো বেসরকারি সেবামূলক সংস্থার দ্বারা নয়। কারণ এসব কাজে বিশাল অঙ্কের মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। উদাহরণত, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর সংস্থান, যেমন প্রতিটি ব্লক বা মহকুমায় গুদামঘর নির্মাণ, বিপনন পদ্ধতির ব্যবস্থা, উৎপাদিত বস্তুর পরিবহণের জন্য কার্যকরী মূলধন ইত্যাদি। এটা একটা সুবিশাল কর্মযজ্ঞ যা সব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে একত্র করলেও সম্ভব হবে না। নমুনা হিসেবে বলা যায় যদি একজন কৃষক ‘জৈবসার’ উৎপাদন করে, সেই সার কিনে নিল ছোট ও মাঝারি কৃষকগণ, তারা আবার সেইগুলি বড় কৃষকদের কাছে বিক্রি করল এইভাবে তাহলে হয়তো তাদের জীবিকা সংস্থান হবে এবং গোরক্ষার বিষয়টিও অর্থবহ হবে। এই সমগ্র বিষয়টি শুধুমাত্র সরকার দ্বারাই কার্যকরী করা সম্ভব, কোনো বেসরকারি সংস্থার দ্বারা নয়।

তাই এদেশে গোরক্ষা এবং গো-সংস্কৃতিকে বহমান রাখতে আলাদা করে গোমন্ত্রালয় এবং গোসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সংস্থান রাখা উচিত যাদের কার্যধারা হবে গোসম্পদ, বিপণন কেন্দ্র, গো-সংস্কৃতির উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং এই কাজ কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়কে একযোগে করতে হবে। ■

সংশোধনী

গত ৩ এপ্রিল ২০১৭ স্বস্তিকায় মোহিত রায়ের ‘পশ্চিমবঙ্গে ইসলামিকরণের সহায় রাজশক্তি’ প্রচ্ছদ নিবন্ধে ছাপা হয়েছে ‘এতে বড় সঙ্গী পায় নেতাজী সুভাষের দাদা শিশির বসুকে’। হবে শরৎ বসুকে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত। —**সম্পাদক, স্বস্তিকা**

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

রামনবমী : পশ্চিমবঙ্গে নিঃশব্দ বিপ্লব

সন্দীপ চক্রবর্তী

জন্মের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ অজস্র শোভাযাত্রা দেখেছে। কিন্তু রামনবমীর দিন সারা রাজ্যজুড়ে যা হয়ে গেল সেরকম নিঃশব্দ বিপ্লব বড়ো একটা দেখেনি। একের পর এক শোভাযাত্রা আছড়ে পড়েছে সেদিন শিলিগুড়ি থেকে কাঁথিতে। দেখা গেছে বিচিত্র জনসমাবেশ। নাতির হাত ধরে দাদু যেমন হেঁটেছেন, ঠিক তেমনি ননদকে সঙ্গে নিয়ে পা মিলিয়েছেন বৌদি। কিংবা সদ্যজাত শিশুকে কোলে নিয়ে মা। কারও হাতে তলোয়ার, কারও হাতে পতাকা, কারও বা শাঁখ। মুখে জয় শ্রীরাম ধ্বনি। একদা লালদুর্গ, এখন মমতাময় পশ্চিমবঙ্গের ইন্টেলেকচুয়াল বাগাড়ম্বর থামিয়ে দিয়ে সেদিন শ্রীরাম ঢুকে পড়েছিলেন আম বাঙালির চেতনায়। চিনিয়ে দিয়ে গেছেন বাঙালির শিকড়।

এদিন সকাল থেকেই ছিল অভুতপূর্ব উদ্দীপনা। সকাল তখন আটটা। হাওড়ার সালকিয়া চৌরাস্তা অঞ্চল একটু একটু করে জেগে উঠছে। হঠাৎ জয় শ্রীরাম ধ্বনি। গেরুয়া পতাকা লাগানো কয়েকটা বাইক ঝড়ের বেগে উড়ে গেল। তবে এটা ট্রেলর। আসল সিনেমা শুরু হবার আগে যা দেখানো হয়। আসল সিনেমা শুরু হলো রাতে। রাত আটটা নাগাদ। বিশাল শোভাযাত্রার জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে কেঁপে উঠল হাওড়া ময়দান সংলগ্ন পঞ্চাননতলা অঞ্চল। শোভাযাত্রার কেন্দ্রে একটি পালকি। সেখানে শিশুরাম দোলনায় দুলছেন। মাইকে গান বাজছে, রামজী কি নিকলি সওয়ারি...। পালকির পাশে হাঁটছিলেন শঙ্কর রায়। অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক। একদা বাম রাজনীতি করতেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন এসেছেন এই মিছিলে?' শঙ্করবাবুর সোজাসাপটা জবাব, 'এসেছি ভয়ে! পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে কতদিন শান্তিতে এখানে থাকতে পারব জানি না।'

কথাটা সত্যি। ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির ক্রমাগত তোষণবাদী রাজনীতি এবং হিন্দুদের একাংশের উদাসীনতার ফলে মুসলমানরা যেভাবে বাড়ছে তাতে ভয় হওয়াটা স্বাভাবিক। বিশেষ করে যাঁরা মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ। তাই এ রাজ্যে ভয়টা বেশি। এবারের রামনবমী উৎসবে পশ্চিমবঙ্গে যে বিপুল জনসমাবেশ দেখা গেছে তা সেই ভয়ের প্রতিক্রিয়া বলে মনে করছেন অনেকে।

একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, শুধু দক্ষিণবঙ্গেই রামনবমী উপলক্ষে ২১৭টি

রামপুরহাট

রামপুরহাট

রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর

কার্যক্রম হয়েছে। অংশগ্রহণ করেছেন ১০,৯৩, ২৫৫ জন। এদের মধ্যে ৬৪,৭৭০ জন মহিলা। বাইক মিছিল হয়েছে ১১টি। অংশ নিয়েছেন ১৭,৮৪২ জন। ৮০৪২টি বাইক ব্যবহৃত হয়েছে। পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষকে নিয়ে শোভাযাত্রা সংগঠিত হয়েছে ৪টি। রাণিগঞ্জের শোভাযাত্রায় হেঁটেছেন ১, ৫০,০০০ জন মানুষ। আসানসোলে ১ লক্ষ। ভাটপাড়া ও চন্দননগরে ৬০,০০০। বিশ হাজারের বেশি মানুষের শোভাযাত্রা হয়েছে পাণ্ডবেশ্বর, বাঁকুড়া, জগদ্দল, রামপুরহাট, কাশীপুর, পানাগড়, জামুড়িয়া এবং কাটোয়ায়। দশ হাজারের বেশি মানুষের শোভাযাত্রা হয়েছে কৃষ্ণনগর, খিদিরপুর, টিটাগড়, বারাসত, তমলুক, পুরুলিয়া, কাঁথি, চুঁচুড়া এবং উলুবেড়িয়ায়। গ্রেপ্তার হয়েছেন ৮৯ জন রামভক্ত।

এদিন তথাকথিত বাম-প্রভাবিত অঞ্চলগুলিও জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে মেতে উঠেছিল। বারাসাতের ময়না অঞ্চলে

কাঁথি

রামভক্তরা মিছিল বের করেছিলেন। হাতে ছিল তির-ধনুক এবং তলোয়ার। পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়। ৩৪নং জাতীয় সড়ক হয়ে চাঁপাডালির মোড় পেরিয়ে পরিক্রমা শেষ হয় শেঠপুকুরে। বিজেপির উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সভাপতি শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শোভাযাত্রায় যাঁরা ছিলেন তারা হিন্দু পরম্পরা অনুমোদিত অস্ত্র হাতে হাঁটছিলেন। এতে অন্যায়টা কোথায়? মহরমে মুসলমানরা যদি অস্ত্র হাতে শোভাযাত্রা করতে পারে তাহলে হিন্দুরা পারবে না কেন?' খড়্গপুরের বিশাল শোভাযাত্রার অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'রামনবমী উৎসবে কোনো রাজনীতি নেই। আমরা সবাই ভগবান শ্রীরামের নামে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে এসেছি। সুরাজ্যের কথা তাদের মনে করিয়ে দিতে এসেছি।' দিলীপবাবুর কথার সূত্র ধরেই বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'রাম ধর্মীয় প্রতীক নন। তিনি হিন্দুদের প্রাণপুরুষ। ভারতের মতো হিন্দু-প্রধান দেশে তাঁকে নিয়ে উৎসাহ তৈরি হবে সেটাই তো স্বাভাবিক।' সশস্ত্র শোভাযাত্রা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়। ধর্মীয় শোভাযাত্রায় অস্ত্র নিষিদ্ধ করতে হলে সবার জন্যেই তা করা

চন্দ্রকোণা রোড

বোলপুর

উচিত।’

উত্তরবঙ্গের যেসব জেলায় প্রায়শই চোরাগোপ্তা সাম্প্রদায়িক হামলা হয় সেখানেও লক্ষ লক্ষ মানুষ জড়ো হয়েছিলেন ভগবান শ্রীরামের ডাকে। উত্তর দিনাজপুরের ঈশ্বরপুর তেমনই একটি জায়গা। প্রায় তিন লক্ষ মানুষ এখানে শোভাযাত্রা বের করেন। উৎসবের সূচনা হয় সূর্য সেন স্পোটিং ক্লাব প্রাঙ্গণে শ্রীরামের মূর্তি পূজার মাধ্যমে। তারপর শুরু হয় শোভাযাত্রা। ৩১নং জাতীয় সড়ক ধরে শোভাযাত্রা এগিয়ে যায় ৪ কিলোমিটার দূরে জীবন মোড়ে জুনিয়র হাইস্কুল ময়দানের উদ্দেশ্যে। আশপাশের গ্রাম থেকে বহু মানুষ এসে মিছিলে যোগ দেন। নারী-পুরুষ যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে শোভাযাত্রায় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। শতাধিক ডিস্কো-জকি এবং বেশ কয়েকটি বাজনার দল যোগ দিয়েছিল। ঈশ্বরপুর শহরের ছোটবড়ো ৩০টি ক্লাবের সদস্যরা সপরিবারে যোগ দিয়েছিলেন। উৎসব শেষে বক্তব্য পেশ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক প্রমুখ রমাপদ পাল। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের সম্পর্ক প্রমুখ গোবিন্দ ঘোষ।

কলকাতায় এদিন মোট ২২টি শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। সকাল থেকেই ‘জয় বজরঙ্গবলী’ এবং ‘হর হর মহাদেব’ ধ্বনিতে কেঁপে ওঠে কলকাতা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী কেন্দ্র ভবানীপুরে সশস্ত্র শোভাযাত্রা ৯টা নাগাদ পৌঁছয়। বিজেপির সমর্থক অভীক চক্রবর্তী বলেন, ‘অস্ত্র ছাড়া শ্রীরামের কথা ভাবাই যায় না। অতএব রামনবমীর শোভাযাত্রা অস্ত্র ছাড়া করা সম্ভব নয়।’ কলকাতার মতো দুর্গাপুরেও এদিন বিশাল শোভাযাত্রা দেখা গেছে। দুর্গাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত নানা বয়েসের মেয়েরা শোভাযাত্রা বের করেন।

বাঁকুড়া

এদিকে রামনবমী উৎসবে মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের পর শুরু হয়েছে রাজনীতি। ব্যানার না ব্যবহার করলেও পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনা করে শ্রীরামনবমী উদ্‌যাপন সমিতি নাম দিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এ রাজ্যে রামনবমী পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। তাদেরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এসেছে এই সাফল্য। কিন্তু তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হিন্দুরা একজোট হতে শুরু করলে তোষণবাদী রাজনীতি করে যে পার পাওয়া যাবে না সেকথা তিনি ভালো করে জানেন। তাই দলকে হনুমান জয়ন্তী পালনের হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু এতে কি শেষরক্ষা হবে? খাগড়াগড় তেহট্ট নন্দীগ্রাম নলিয়াখালি কালিয়াচক জুরানপুরের মানুষ কি তাঁকে বিশ্বাস করবেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সাম্যব্রত নন্দী। আইটি পাঠরত এক যুবক। রামনবমীর শোভাযাত্রায় হাঁটতে হাঁটতে তিনি বলেন, ‘যাতে হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত না হন সেইজন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন পদবি ত্যাগ করেছিলেন। এত বড়ো বিশ্বাসঘাতকতার পর মানুষ আর তাকে বিশ্বাস করবে না।’

হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রায় লাঠি, বোমা

রামভক্তরা রাস্তায় নামায় বিরোধীরা দিশাহারা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ একদিকে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠার ভয়, অন্যদিকে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক হাতছাড়া হবার সম্ভাবনা— দুই-এর চাপে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল এখন দিশেহারা। নয়তো হনুমান জয়ন্তীর নিরীহ শোভাযাত্রায় প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে নির্লজ্জ দমনপীড়ন করত না। সিউড়িতে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রায় নির্বিচারে লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৮ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ক্ষুব্ধ রাজ্য বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে। অনেকটা একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে হুগলির বাঁশবেড়িয়াতেও। সেখানে শোভাযাত্রায় বোমা ছোঁড়া হয়। আহত হন ৫ জন।

সিউড়িতে হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে শোভাযাত্রা বের করেছিল হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। প্রশাসনের অভিযোগ, অনুমতি না নিয়েই এই শোভাযাত্রা বের করা হয়। সেজন্য পুলিশ সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডের কাছে ব্যারিকেড করে মিছিল আটকায়। সেই ব্যারিকেড ভেঙে মঞ্চের সমর্থকরা এগোতে চাইলে পুলিশ নির্বিচারে লাঠিচার্জ করে। আহত হয়েছেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ৮ জন সমর্থক। তাঁরা এখন সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের অভিযোগ, নিয়ম মাফিক দশ দিন আগেই পুলিশ সুপারের কাছে শোভাযাত্রায় অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত জমা দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ সুপার মৌখিক অনুমতিও দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন মঞ্চের সমর্থকেরা। কিন্তু হনুমান জয়ন্তীর আগের দিন রাতে পুলিশ সুপার ফোন করে জানান শোভাযাত্রা বের করা যাবে না। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের অভিযোগ, একেবারে শেষ মুহূর্তে অনুমতি নাকচ করে দেবার উদ্দেশ্য মঞ্চকে উচ্চ আদালতে যেতে না দেওয়া। এভাবে হঠাৎ অনুমতি বাতিল করার ঘটনাও এই প্রথম নয় বলে তাদের অভিযোগ। এর আগে মাইক বাজানোর অনুমতিও শেষ মুহূর্তে বাতিল করে দেন মহকুমা শাসক এবং তথ্যসংস্কৃতি দপ্তর। সিধু-কানু মঞ্চে সমাবেশ করার অনুমতি মাত্র তিন দিন আগে বাতিল হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব

সিউড়িতে শোভাযাত্রার উপর পুলিশের লাঠিচার্জ।

খড়্গপুর

ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী বহু মানুষ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গেটের সামনে উপস্থিত হন। অপর একটি জমায়েত হয় বড়বাগান এলাকার একের পল্লীতে। ত্রিনাথ আখড়া থেকে শোভাযাত্রা বের করার সময় বাধা দেয় পুলিশ। র‍্যাফ নামে। কিন্তু পুলিশের বাধা বেরিয়ে শোভাযাত্রা এগিয়ে যায়। দত্তপুকুর মোড়ে রাম-সীতা-হনুমান-শিব সেজে শোভাযাত্রায় অংশ নেন অসংখ্য মানুষ। ট্রাকে ছিল সুসজ্জিত বজরঙ্গবলীর মূর্তি। প্রায় হাজার দশেক সমর্থক বাসস্ট্যান্ড হয়ে জে এল ব্যানার্জি রোড দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ আবার বাধা দেয়। ওখানে আগে থেকেই পুলিশ ব্যারিকেড করে দাঁড়িয়েছিল। সমর্থকরা ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করলে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। অভিযোগ, বজরঙ্গবলীর ভক্তদের চড়থাপ্পড় এমনকী লাথিও মারে পুলিশ। মাটিতে পড়ে যান কেউ কেউ। ৮ জন আহত হন। এই ঘটনায় সিউড়ি জুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মণ্ডল বলেন, 'পুলিশ শাসকদলের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' বিজেপির রাজ্য সম্পাদক সায়ন্তন বসু এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান সিউড়ির ঘটনার প্রতিবাদ সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

অন্যদিকে, হুগলির বাঁশবেড়িয়ার কলবাজার থেকে হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে যে শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল তার ওপর বোমা ছোঁড়া হয়। শোভাযাত্রাটি শিবপুর ঝুলানিয়া মোড় ঘুরে আবার কলবাজারে ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছবার আগেই শোভাযাত্রায় বোমা পড়ে। তারপর আরও বেশ কয়েকবার বোমা ছোঁড়া হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। নামানো হয় র‍্যাফ ও পুলিশবাহিনী। অভিযোগ, সন্ধ্যেবেলায় শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী কয়েকজনের দোকানে আগুন লাগিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। পুলিশের বক্তব্য এ কাজ সাধারণ দুষ্কৃতীদের। যদিও সাধারণ দুষ্কৃতীরা কবে থেকে এ রাজ্যে রাজনৈতিক প্রতিশোধ নেবার ব্যাপারে এমন তৎপর হয়ে উঠল, এ প্রশ্নের জবাব পুলিশের পক্ষ থেকে কেউ দেননি। হুগলির পুলিশ সুপার সুকেশ জৈন বলেন, 'শোভাযাত্রা শেষ হওয়ার পর একটি বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। শুনেছি কয়েকজন আহত হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে।' স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্য বিজেপি এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে। শোনা যাচ্ছে, সিউড়ি ও বাঁশবেড়িয়ার ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পর্যবেক্ষক দল পাঠাতে পারে। ■

কৃষ্ণনগর

বাঁশবেড়িয়ার শোভাযাত্রায় বোমা।

এই সময়

২ মাসে ২৪২ কেজি

মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার বাসিন্দা ইমান আহমেদ নানান উপসর্গ নিয়ে দু'মাস আগে

মুম্বইয়ের হাসপাতালে ভর্তি হন। প্রধান উপসর্গ হরমোনজনিত কারণে অস্বাভাবিক ওজন বৃদ্ধি। যখন ভর্তি হয়েছিলেন তখন ওজন ছিল ৪৯৮ কেজি। দু' মাসে ওজন কমেছে ২৪২ কেজি। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন ভাল আছেন ইমান।

প্লাস্টিক ব্যাগে নিষেধাজ্ঞা

মধ্যপ্রদেশ সরকার ১ মে থেকে রাজ্যে সব ধরনের প্লাস্টিক এবং পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিবেশ দূষণের জন্যে তো বটেই, গবেষণায় দেখা

গেছে, প্লাস্টিক ব্যাগ গোরুর অকালমৃত্যুর জন্যেও অনেকাংশে দায়ী। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালে পরিবেশবিদ সুভাষ পাণ্ডে-কৃত একটি অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত।

আয়ু ১১,০০০ বছর

এত দিন জানা ছিল সব থেকে বেশিদিন বাঁচে কচ্ছপেরা। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে সমুদ্রের এক ধরনের স্পঞ্জ ১১,০০০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। গবেষক মারাহ জে. হার্ডট তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্য প্রকাশ করেছেন সেক্স ইন দ্য সি গ্রন্থে।

ঈশ্বরপুর, উত্তর দিনাজপুর

চুঁচুড়া

কলকাতা

এই সময়

কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়...

রঙ্গ বলে রঙ্গ! স্ত্রী পদবি বদল করে স্থানীয় সুপার মার্কেটে আয়োজিত লটারিতে

অংশগ্রহণ করতে চান। স্বামী রেগে গিয়ে স্ত্রীর গাড়ি সিমেন্টের চাঁই দিয়ে ভর্তি করে দিলেন। ঘটনাটি ঘটেছে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবুর্গে। ইউটিউবে প্রকাশিত ভিডিয়ো থেকে জানা গেছে লটারির পুরস্কার মূল্য ছিল ৫০,০০০ রুবল। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫৭,০০০ টাকা।

খাবার নষ্ট বন্ধ করতে

প্রন পকোড়ার প্লেটে কত পিস চিংড়ি আছে কিংবা চিলি চিকেনের প্লেটে ক'টা লেগপিস আছে যদি আগে থেকেই আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হয় তাহলে

কেমন হয় বলুন তো? কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান এই নিয়মই চালু করতে চান। উদ্দেশ্য খাবার নষ্ট বন্ধ করা। হাজার হোক, আগে থাকতে জানা থাকলে আপনি খিদে বুঝে অর্ডার দিতে পারবেন।

ফ্রিজে ১২ ফুট পাইথন

কেপটাউনের এক সুপারমার্কেটে একজন মহিলা গিয়েছিলেন ইয়োগার্ট কিনতে। কিন্তু দুগ্ধজাত খাবার রাখার ফ্রিজের দরজা খুলতেই

বেরিয়ে এল ১২ ফুট দৈর্ঘ্যের পাইথন। ভাগ্য ভাল কাউকে আক্রমণ করেনি। এক কর্মী জানিয়েছেন, সুপারমার্কেটের চারপাশে অজস্র ঝোপঝাড়। সেখানেই সাপের বাস।

কলকাতা

মেদিনীপুর

কালিয়াগঞ্জ

এই সময়

সীতার জন্মস্থান

বাজেট অধিবেশনের শেষদিনে রাজ্যসভা জনকনন্দিনী সীতার জন্মস্থানকে

কেন্দ্র করে উদ্ভূত বিতর্কে উত্তাল হলো। সাংসদ প্রভাত ঝা সীতার জন্মস্থান সীতামাড়ির উন্নয়ন নিয়ে কেন্দ্র কী ভাবছে এই প্রশ্ন তুলে বিতর্কের সূচনা করেন। সংস্কৃতি মন্ত্রী মহেশ শর্মা জানান সীতামাড়ি রামায়ণে বর্ণিত ধর্মরাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কেন্দ্র এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

দেওয়াল নয়

শোনা যাচ্ছিল ভারত নাকি পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর দেওয়াল তুলতে চায়। উদ্দেশ্য

জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানিয়েছেন এরকম পরিকল্পনা কেন্দ্র সরকারের নেই।

১৭-য় ৩৩

২০১৭-য় এখনও পর্যন্ত ৩৩ জন জঙ্গি নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলিতে নিহত হয়েছে।

সংখ্যাটা ২০১৬ সালে ছিল ১৪৯ এবং ২০১৫-তে ১০২। এ বছর ৪৩টি অনুপ্রবেশের চেষ্টাও রুখে দিয়েছে নিরাপত্তাবাহিনী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী হংসরাজ গঙ্গারাম আহির সম্প্রতি লোকসভায় এই কথা জানান।

দুর্গাপুর

আদ্রা, পুরুলিয়া

মাথাভাঙ্গা

অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি হওয়া কেন এত জরুরি

অতিথি কলম

চেতন ভগত

হিন্দুদের তথাকথিত বৌদ্ধিক বা ইন্টেলেকচুয়াল শ্রেণীর মধ্যে হিন্দুত্বকে খাটো করে দেখা বা উপহাসের পাত্র করে তোলা ইদানীং একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু হিন্দুত্ব নয় এর সঙ্গে সংযুক্ত বা সম্পৃক্ত অন্য যে-কোনো বিষয় সম্পর্কেই একটা নিচু ধারণা পোষণ করাটাই তাদের রীতি। আমি ব্যক্তিগত ভাবে যেটা মনে করি যে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ করার দাবি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। সেই বিষয়টির আলোচনাও কিন্তু এই বিশিষ্ট চক্রের মধ্যে একান্তই নিষিদ্ধ বস্তু। ইংরেজি সংবাদমাধ্যমের আলোচনাগুলিতে অংশগ্রহণকারী এক বিশেষ প্রজাতির উন্মার্গী ভারতীয়রা পবিত্র অযোধ্যা ভূমিতে মন্দির নির্মাণাকাঙ্ক্ষীদের কণ্ঠকে বরাবর দাবিয়ে দিয়ে আসছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে সর্বসমক্ষে খোলামনে আমি ব্যক্ত করতে চাই যে শান্তিপূর্ণ পথে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই অযোধ্যায় একটি সুষমামণ্ডিত রামমন্দির হোক। আমি এই দাবির পূর্ণ সমর্থক। সত্যি কথা বলতে কী এটা নিতান্তই হাস্যকর যে, হিন্দুদের পবিত্রতম এক ভূমিতে তাদের অন্যতম আরাধ্য দেবতার একটি মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য তাদের নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানাতে হবে।

এখানে অবশ্যই একটা কথা বলা আবশ্যিক যে, এই মন্দির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ২৫ বছর আগে ১৯৯২ সালে যে হিংসার স্ফুরণ হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তিকে কখনই সমর্থন করা যাবে না। সেদিনের ঘটনা ভুল, দুর্ভাগ্যজনক ও কিছুটা বিধিভঙ্গকারী যে ছিল তা অস্বীকার করা যাবে না। তাই এর পুনরাবৃত্তি হতে দেওয়া যায় না। কিন্তু তা বলে এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে হিন্দুদের পবিত্র থেকে পবিত্রতম একটি স্থানে একটি বিনষ্ট মন্দিরকে পুনর্নির্মাণের যে অকাট্য যুক্তি রয়েছে তাকে কোনোভাবে অস্বীকার করা যাবে। এ লেখার একটি মাত্রই উদ্দেশ্য এত বছর ধরে যে নানান তর্কজাল বিস্তার করে বিচিত্র ছুতোয় এই মন্দির নির্মাণ প্রকল্পকে আটকে রাখা হয়েছিল সে সমস্তকে নস্যাৎ করে যতশীঘ্র সম্ভব মন্দির নির্মাণ কর্ম শুরু হোক।

মন্দির না তৈরির পক্ষে প্রথম যুক্তি ছিল কেন স্থিতাবস্থাকে ভঙ্গ করা হবে? এই মতাবলম্বীরা প্রচার করেন, হ্যাঁ, মন্দিরের অস্তিত্ব হয়তো ছিল কিন্তু সে ইস্যু এখন অচল হয়ে গেছে। তাই তাকে আবার খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলা কেন? এতে তো কেবল শান্তিই বিঘ্নিত হবে। এ প্রসঙ্গে আমার মনে হয় মুসলমান সম্প্রদায় বা তাদের সেই সমস্ত নেতা যারা তাদের প্রতিভূ বলে দাবি করে তাদের প্রথমেই মন্দির তৈরির প্রচেষ্টাকে আন্তরিক আশীর্বাদ করা উচিত। এই নির্মাণস্থলটি কোনো আর পাঁচটা স্থানের মতো নয়। এই সেই পুণ্যতম স্থান যেখানে হিন্দুধর্মের সর্বাধিক পূজিত এক দেশপ্রেমী পুরুষ জন্ম নিয়েছিলেন। দেওয়ালী ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পূর্বতন মন্দিরগুলির জায়গায় দেশের চারদিকে মাথা তুলে রয়েছে হাজার হাজার মসজিদ। এই ধ্বংসলীলা মুসলমান শাসকদের সৌজন্যের ফল। কেউ কিন্তু সেই মন্দিরগুলির পুনরুত্থান দাবি করছে না। কিন্তু অযোধ্যা! এটি যে মর্যাদাপুরুষোত্তম রামের জন্মভূমি— তাঁর ভূমিতে আর পাঁচটা মসজিদের মতো অন্য কোনো মসজিদের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। ওই মসজিদ অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হতে পারে। কিন্তু প্রভু রামের ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিব্য স্থানটি বহু শতাব্দীর লালিত বিশ্বাসের আবাসস্থল। আমরা তার স্থানান্তর হতে দিতে পারি না। আর

অযোধ্যা— মর্যাদাপুরুষোত্তম রামের জন্মভূমি— তাঁর ভূমিতে আর পাঁচটা মসজিদের মতো অন্য কোনো মসজিদের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। ওই মসজিদ অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হতে পারে। কিন্তু প্রভু রামের ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিব্য স্থানটি বহু শতাব্দীর লালিত বিশ্বাসের আবাসস্থল। আমরা তার স্থানান্তর হতে দিতে পারি না।

পাঁচটা মসজিদের মতো এটিকে সরিয়ে নেওয়া যেতেই পারে। আরও বড় করে কাছেই বা নিকট দূরে তৈরি করা কোনো ব্যাপার নয়। মুসলমান সম্প্রদায় এমন একটা সর্বাংশে যুক্তিযুক্ত ন্যায্য দাবিকে কেন স্বীকার করে নেবে না? শুধু মাত্র তাদের কিছু স্বঘোষিত নেতা রাজনৈতিক ভাবে এর বিরোধিতা করছে সেই অজুহাতে? আমি নিশ্চিত দেশের সাধারণ মুসলমান সমাজ হিন্দুদের তরফে এই অনুরোধকে অবশ্যই মান্যতা দেবে। হ্যাঁ, আমাদের সরাসরি তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। মত বিনিময় করতে হবে। আর এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এটা করা মোটেই কঠিন নয়।

‘মন্দিরের জায়গায় একটা হসপিটাল তৈরি হোক’— এটি ছিল মন্দিরের বিরুদ্ধবাদীদের দ্বিতীয় যুক্তি। অবশ্যই আমরা হাসপাতাল তৈরি করব তবে সেটা যে ওই জায়গাতেই করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে না। হাসপাতাল তৈরির মানদণ্ড হচ্ছে এটা সেখানেই হবে যেখানে মানুষের চিকিৎসার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। শুধু তাই নয় এটি যে-কোনো জমির ওপরই নির্মিত হতে পারে। এমন পুণ্যপবিত্র ভূমির ওপরই বা কেন তা নির্মাণ করা জরুরি? হ্যাঁ, ওই জায়গায় আমরা মন্দির নির্মাণের পর আশপাশেই একটি সেরা হাসপাতাল নির্মাণও অনায়াসেই করে দিতে পারি।

এরপর তৃতীয় যুক্তি ‘ভগবান তো সর্বত্রই বিরাজমান’—তাহলে কেবল ওই জায়গাতেই বা কেন তাকে অধিষ্ঠিত করতে হবে? এরই সঙ্গে পিঠোপিঠি প্রশ্ন— কী প্রমাণ আছে যে রাম ওখানেই জন্মেছিলেন। উত্তর আপনিই দিয়েছেন ‘ভগবান সর্বত্র বিরাজমান’। কিন্তু তবু আমরা পূজা-অর্চনার আলাদা স্থান নির্বাচন করি। কেননা যখন আমরা সেখানে প্রবেশ করি তখন যেন ঈশ্বরচিন্তায় একাত্ম হতে পারি। মগ্ন হতে পারি। এই সূত্রে আমাদের হাতে প্রমাণ আছে যে ওই কাঙ্ক্ষিত স্থানটিই প্রভু রামের জন্মস্থান। প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের খনন কার্য চালিয়ে দেখা গেছে সেখানে প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব রয়েছে। আর সেই প্রমাণগুলি রয়েছে মসজিদের আগে মন্দিরের প্রাচীনত্বের সাক্ষী হিসেবে যা বহু শতাব্দীর বিশ্বাসেও চিরসজীব।

মনে রাখা দরকার, ভারত একটি দেশ যে অন্য সব ধর্মকে সম্মান করে। আর বারবার এটি প্রমাণ করতে গিয়ে অনেক সময়ই আমরা সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সংবেদনশীল হয়ে পড়ার ঝোঁকে পড়ে যাই। এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠের যে ধর্মবিশ্বাস আর তার যা প্রাপ্য মর্যাদা সেটা আমরা দিতে ভুলে যাই। রামমন্দিরের বিষয়টি এরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিগত সরকারের আমলে মুসলমান তোষণ এমন একটা পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে হিন্দুদের তরফে যে-কোনো ন্যায়সঙ্গত অনুরোধকেও ভয় দেখানোর তকমা দেওয়া হোত। অর্থাৎ হিন্দুরা মন্দির দাবি করে অন্যায় চোখ রাঙাচ্ছে যদি মুসলমানরা রেগে যায়? অথচ এই মন্দিরটি ভারতের দুটি প্রধান ধর্মাবলম্বী মানুষের পারস্পরিক বোঝাপড়ার সৌহার্দ্যের একটি ফলক হয়ে থাকতে পারে। একটি মন্দিরকে তার হৃত গৌরবের স্থানে ফিরিয়ে দিয়ে বিশেষ করে সেটির যেখানে এক সবিশেষ সংবেদনশীল মর্যাদা রয়েছে। তার অনতিদূরেই একটি মসজিদ হয়তো খুবই জাঁকজমকপূর্ণভাবে নির্মাণ করে দিলে ইসলামের কৌলিন্য কোনো ভাবেই ক্ষুণ্ণ হতে পারে না। বাস্তবে মন্দির ও মসজিদ নির্মাণ শেষ হয়ে গেলে অযোধ্যায় যে পরিমাণ পর্যটকের ভিড় হতে পারে তাতে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরই রোজগারের প্রভূত সম্ভাবনা থেকে যায়।

এই সূত্রে শুধু একটি মাত্র বিষয়েই আমাদের সবিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে এই নির্মাণ প্রকল্প নিয়ে কোনো অহেতুক সাম্প্রদায়িক হিংসা না সৃষ্টি হয়। আজকের দিনের চূড়ান্ত ডিজিটাল সংযোগের দুনিয়ায় সে সম্ভাবনা ন্যূনতম। আজ সমগ্র হিন্দু সমাজের তরফ থেকে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে যৌথ আবেদন ‘আমাদের নিজেদের মন্দিরটি করতে দিন।’

এই নির্মাণ প্রকল্পকে আপনাদের শুভকামনা জানান। সঙ্গে সঙ্গে নিকটে সুন্দর মসজিদের জন্যও শুভেচ্ছা জানান যাতে সমগ্র বিশ্বকে আমরা দেখাতে পারি যে আমরা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় তীর্থস্থানের যুগ্ম সফল সহাবস্থান করতে সক্ষম। ■

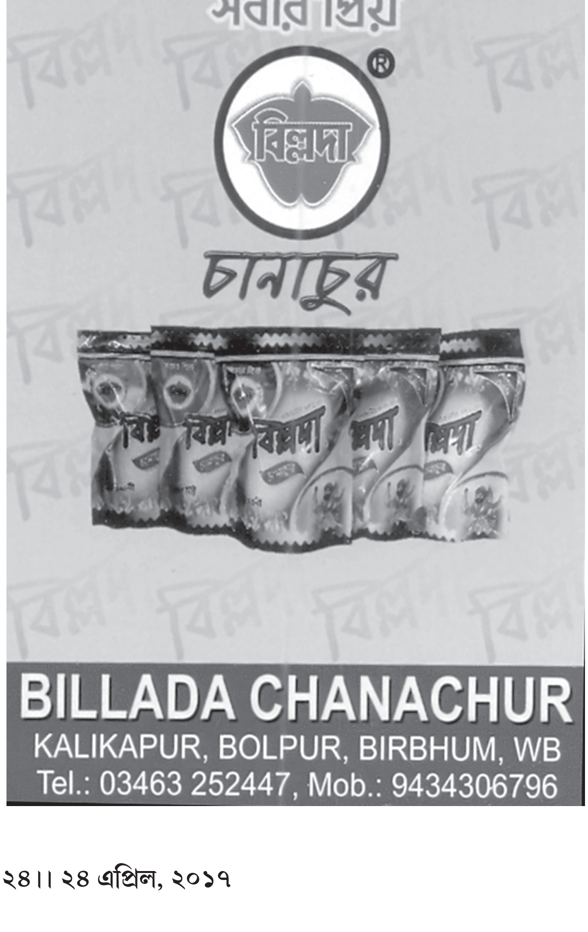

চিঠিপত্র

দেশদ্রোহীদের সাজা

গত ১ এবং ২ এপ্রিল যথাক্রমে যাদবপুর কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হলে এবং অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস হলে ক্যাম্ব নামক একটি সংস্থার সভা চলাকালে বহু বিদেশি গণ্যমান্য অতিথির উপস্থিতিতে সভাস্থলের সামনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাওবাদী ছাত্রসংগঠন ইউ এস ডি এফ-এর সদস্যরা সভা বানচাল করার চেষ্টা করে। তারা অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ এবং কাশ্মীর, নাগাল্যান্ড এবং মণিপুরের আজাদির স্লোগান দেয়। উল্লেখ্য, ওই সভায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের উপর একটি আলোচনাসভার আয়োজন করেছিল ক্যাম্ব। ভারত এখনো হিন্দু প্রধান দেশ বলে এই অতিবাম ছাত্র সংস্থার সদস্যরা নিস্তার পেয়ে গেল। এই মাওবাদীদের পিতৃভূমিতে এই দেশদ্রোহীদের কী সাজা হয় তার একটা নমুনা এখানে তুলে ধরছি যা গত ৪.১.২০১৪ তারিখে কলকাতার একটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে।

'কুকুরের খাঁচায় মৃত্যুদণ্ড'

বেজিংয়ের সংবাদ, উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উনের পিসেমশাই ও রাজনৈতিক মন্ত্রণাদাতা জ্যাং সং থিঙ্গ ও তাঁর পাঁচ সঙ্গীকে বিবস্ত্র করে ক্ষুধার্ত ডালকুত্তার খাঁচায় ফেলে দিয়ে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল। চীনের এক সংবাদপত্র বলছে, এক ঘণ্টার মধ্যেই রাষ্ট্রদ্রোহে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিদের ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছিল। তিনদিন ধরে উপবাসে রাখা ১২০টি ডালকুত্তার খাঁচায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জংউনের পিসেমশাই ও রাজনৈতিক গুরু জ্যাং সংথিঙ্গ এবং তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের। পরনে কাপড় নেই, পালিয়ে বাঁচার মতো জায়গা নেই এমন পরিস্থিতিতে উত্তর কোরিয়ার কয়েকশো পদস্থ কর্তা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন কীভাবে ক্ষুধার্ত কুকুরের দাঁতে রাষ্ট্রদ্রোহে অভিযুক্ত মানুষগুলো ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা-৬৪।

সেন মহাশয়কে কয়েকটি বিনম্র প্রশ্ন

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ স্বস্তিকায় মাননীয় রন্তিদেব সেনগুপ্ত মহাশয়ের লেখা 'সেন মহাশয়কে কয়েকটি বিনম্র প্রশ্ন' উত্তর সম্পাদকীয়টা বেশ মনোযোগ সহকারে পড়লাম। পড়বার পর মনে হলো শ্রী সেনগুপ্ত মহাশয় এমন কিছু ভুল করেছেন, যেগুলো না করলেই ভাল করতেন। যথা :

অমর্ত্য সেন অবশ্যই সর্বজন শ্রদ্ধেয়, কিন্তু তাই বলে রন্তিদেব সেনগুপ্ত সর্বজন শ্রদ্ধেয় নন— একথা মানতে হবে কেন? কেন তিনি অহেতুক সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন? কর্মসূত্রে দীর্ঘ পনেরো বছর লক্ষ্ণৌতে ছিলাম, ও রাজ্যের একটি খুব প্রচলিত কথা আমার মনে বেশ দাগ কেটেছে। কথাটা হলো, 'ভঁৈসকা আগে বীণ বাজানা।' সবাই যেটাকে খালি চোখে দেখতে পাচ্ছে কিছু পণ্ডিত সেখানে মাইক্রোস্কোপ লাগিয়ে দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিয়ে দেয়।

স্বামী বিবেকানন্দও এই পণ্ডিতদের মানসিকতাকে বৌদ্ধিক প্রভুত্ববাদ বলে বর্ণনা করেছেন। এই প্রভুত্ববাদের নেশা ড্রাগের নেশার থেকেও মারাত্মক। সুতরাং বাংলাদেশ থেকে বিধর্মী হিন্দু বিতাড়নের সঙ্গে সেদেশের 'সার্থক' ভূমি সংস্কারের কী সম্পর্ক তার যথার্থ উত্তর আমরা কোনোদিনই পাব না। আর যে প্রশ্ন যতই বিনম্র-সহকারে করা হোক না কেন।

শ্রী সেনগুপ্ত মহাশয় বিনীতভাবে বলেছেন, 'আমরা তাঁর মতো পণ্ডিত নই।' এটাও একটা মারাত্মক ভুল। শ্রী সেনগুপ্ত মহাশয় শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি ভালোভাবেই জানেন যে, কামারপুকুরের এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণ হৃদয়হীন পণ্ডিতদের চিল-শকুনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই সিদ্ধান্ত নেবার জন্য তাঁকে ইংল্যান্ড-আমেরিকা যেতে হয়নি।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কিছু বুদ্ধিজীবী ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করলেন (কেন করলেন সেটা আজও অজানা) যে, নরেন্দ্র মোদী যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী রূপে নির্বাচিত হন তা হলে তাঁরা ভারত ছেড়ে চলে যাবেন। তাঁদের সেই পচ্ছন্দের দেশটির কথা আমরা আজও জানি না। যাই হোক, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হলেন। আর আমাদের ওই বুদ্ধিজীবীরা দেখিয়ে দিলেন তাঁরা আসলে এক-একটি চিল শকুন। এইসব নীতিহীন পণ্ডিতেরা যে ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। এই জন্য গভীর বেদনার সঙ্গে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'ভারতবাসীর মতো দেশপ্রেমহীন আর কোনো জাতি পৃথিবীতে আছে কি?" (বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১০৪ পৃ.) কন্যাকুমারীর শিলাখণ্ডে তিনি তিনদিন ভারতমাতার ধ্যান করেছিলেন। আর আমাদের এইসব বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের আরাধ্য দেবতা খুঁজতে যান হিমালয়ের উত্তরে অথবা আরব সাগরের ওপারে।

শ্রদ্ধেয় অমর্ত্য সেন মহাশয় ডাইরেক্ট অ্যাকশন দেখেছেন, নোয়াখালির নারকীয় হিন্দু নিধন দেখেছেন, দেখেছেন দেশভাগ এবং হিন্দু-বিতাড়ন। পাকিস্তান হিন্দুশূন্য হয়ে গেল, কাশ্মীর থেকে হিন্দু পণ্ডিতেরা বিতাড়িত হলো। এসব কেন ঘটলো তা সেন মহাশয়ের মাইক্রোস্কোপে ধরা পড়েনি— কোনোদিন পড়বেও না। এখন অদৃশ্য কার্য-কারণবশত ধরা পড়ল যে, পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা 'স্বেচ্ছায়' দেশত্যাগ করেছে বলেই ওদেশে ভূমি-সংস্কার আন্দোলন 'শান্তিপূর্ণভাবে' সম্পন্ন হয়েছে। হায় বিবেকানন্দ, এই হলো আপনার স্বপ্নের ভারত!

সেন মহাশয়কে একটি তথ্য পরিবেশন করছি। যদি এর মধ্যে অর্থনীতির কোনো তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারেন তাহলে আমার ঠাকুর ঘরে আপনার একটা ছবি রেখে দেব। তথ্যটি হলো :

The Times of India
Date : 3 March 2017

ঘোষণা করেছেন IS Chief (caliph) ঘোষণা হলো : Baghdadi ordered closure of the IS office regulating the groups fighters and asked the group's non-Anab fighters to either return to their countries or detonate themselvs, promising them "72 women in heaven."

এর মধ্যে আমরা অর্থনীতির কোনো তত্ত্ব খুঁজে পাচ্ছি না, যেমন পাচ্ছি না বাংলাদেশের ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে। তবে সেন মহাশয় আপনি অসাধ্য সাধন করতে পারেন— এই বিশ্বাস এই পত্রলেখকের আছে।

—**প্রভাত কুমার মণ্ডল,**
ফুলেশ্বর, হাওড়া।

বাঙালি কেন পারে না?

উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ভারতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করলো। হিন্দি বলয়ের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে এতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রথম বিজেপি সরকার গড়লো। উত্তরপ্রদেশের ভোটার জাতি বর্ণের নামে এতদিন বিভক্ত ছিল। এই প্রথম সেখানে উন্নয়নের জন্য ভোট হলো। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মুসলমান ভোট। মুসলমানদের একটি অংশের ভোট এবার বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছে। মুসলমানরা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির টুপি পরে নামাজ পড়া বা ইফতারে অংশগ্রহণের মতো ভাঁওতাবাজিকে ছুঁড়ে ফেলে মোদীজীর সবকা সাথ সবকা বিকাশের পক্ষে রায় দিয়েছেন। একটা সময় ছিল যে, বঙ্গ আজ যেটা ভাবতো সারা ভারত পরের দিন সেটা ভাবতো। সেইসব কথা আজ সোনালি ইতিহাস। আজ আমাদের রাজ্য সবদিকে পিছিয়ে চলছে। সরকারি অফিসে স্বাভাবিক নিয়োগ প্রায় বন্ধ। টেটের ফল প্রকাশ হলো অথচ প্যানেলের খবর আমাদের জানা নেই। উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে ছ'বছরে একবার মাত্র নিয়োগ হয়েছে, অথচ বহু পদ এখনো শূন্য। প্রশাসন শাসকের দল দাসে পরিণত হয়েছে। নারদা সারদায় শাসক দলের মন্ত্রীরা নেতার উদ্বিগ্ন।

এই সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে রাজ্যের মুসলমান ভাই-বোনেদের ব্যবহার করে চলেছে। চলছে মুসলমান তোষণ। এর ফলে রাজ্যে জেহাদি তাণ্ডব বেড়ে চলেছে। হিন্দুরা আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। একটা সময় গ্রামের বিভিন্ন পুজোগুলিতে গ্রামের সমস্ত সম্প্রদায় আনন্দ করতেন আজ সেখানে প্রতিমা আক্রান্ত হচ্ছে। অতিমাত্রায় মুসলমান তোষণ রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বহু অংশে নষ্ট করছে। তাই এই পরিস্থিতিতে বাঙালির মনে কি প্রশ্ন আসে না যে, উত্তরপ্রদেশ ২০১৭-তে যা পেরেছে ২০২১-এ বাঙালি তা কেন পারবে না?

—**পদ্মপ্রিয় পাল,**
কাশিম বাজার, মুর্শিদাবাদ।

সপ্তম রাজ্য বাজেটের খতিয়ান

দেশের ও সব রাজ্যের আর্থিক বছরের শেষে নতুন আর্থিক বছর শুরু হবার পূর্বে, রেলের ক্ষেত্রে যাত্রীভাড়া ও পণ্যমাশুল কতটা বাড়বে কতটা কমবে তা রেলমন্ত্রক যেমন ঠিক করে তেমন নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের ক্ষেত্রেও নতুন আর্থিক বছরের শুরু থেকে কতটা কমবে কতটা বাড়বে তা ঠিক করে রাজ্যের ও দেশের অর্থমন্ত্রক। এই বাজেট পেশ হবার পরের দিন সংবাদপত্রে প্রকাশ হোত বাজেটে কোন কোন দ্রব্যের দাম বেড়েছে কোন কোন দ্রব্যের দাম কমেছে।

৩৪ বছরের অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যের বর্তমান তৃণমূলের রাজত্বের প্রায় সপ্তমবর্ষ অতিক্রান্ত। তাই এখনই উপযুক্ত সময় দিদির রাজত্বে কী কী বেড়েছে আর কী কী কমেছে তা দেখার।

শুনতে খারাপ লাগলেও প্রথমেই বলতে হয় বিগত সাতবছরে বেড়েছে— ধর্ষণ, সিন্ডিকেটরাজ, ক্যাডারদের দৌরাত্ম্য, শিশুচুরি, চিকিৎসকদের চিকিৎসায় অবহেলা, চিকিৎসায় পাঁচ হাজার টাকার প্যাকেজ দুই লক্ষ টাকায়, এক শ্রেণীর সম্প্রদায়কে অতিরিক্ত তোষণ, নির্বাচনে রিগিং, খুন, জখম, রাহাজানি, রাজ্যের যুবসমাজকে হাতে রাখার জন্য হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ক্লাবগুলিকে দু' কিস্তিতে তিন লক্ষ টাকা দান। বেকারের সংখ্যা বেড়েছে জ্যামিতিক হারে। চিট ফান্ডের রমরমা, যার ফলে আমানতকারীদের আত্মহত্যা, সাপেকাটা রোগী বর্ধমানের হাসপাতালে এলে তাদের মৃত্যুর সংখ্যা একশো ভাগ। বিদ্যুতের দাম। মদ খেয়ে মারা গেলে সেই পরিবারকে দান, প্রথমে সংখ্যালঘু ছাত্রীদের সাইকেল প্রদান, পরে সর্বসাধারণ ছাত্রীছাত্রদের। তোলাবাজি, শিক্ষায় নৈরাজ্য, পাঠ্যপুস্তকে হিন্দুদেবদেবীর নাম উচ্ছেদ করার প্রবণতা, শিক্ষায় নৈরাজ্য।

দিদির রাজ্যে কমেছে চাষির চাষের উৎপাদিত ফসলের দাম (যার ফরে অনেক চাষি আজ অবাধ আত্মহত্যা করেছে), মানুষের জীবনের দাম (বিরোধিতা করলে বা বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলের সদস্য হলে), মহিলাদের সতীত্বের দাম। পুলিশের আইনি ক্ষমতা (যেটা শাসকশ্রেণীর ক্যাডাররা চালায়)। শিক্ষার মান (যার ফলে পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা রাজ্যে ও সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অকৃতকার্য হচ্ছে)। বিরোধী রাজনৈতিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের চাকরি পাওয়া, রাজ্যের সকলপ্রকার শিক্ষা স্থাপন। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এবার বিচার করুক ম্যাডামের এই সপ্তবার্ষিকী বাজেট জনমুখী নাকি জনবিরোধী?

—**দেবপ্রসাদ সরকার,**
মেমারী, বর্ধমান।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

পরম্পরা

তত্ত্বকে ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠার রূপকার

রাকেশ দাশ

শ্রীরামচন্দ্র ধর্মের বিগ্রহ— রামো বিগ্রহবান্ ধর্ম। যেন ধর্ম স্বয়ং একটি বিগ্রহ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন। সংসারের রঙ্গমঞ্চে ব্যক্তির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়। সেখানে প্রতিটি ভূমিকায় ধর্ম থেকে এক চুল বিচ্যুত না হয়ে যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের আদর্শ শ্রীরামচন্দ্র। সেজন্যই তিনি মর্যাদা পুরুষোত্তম। পুত্র রূপে, পতি রূপে, ভ্রাতা রূপে রাজা রূপে, মিত্র রূপে এমনকী শত্রু রূপে তার ভূমিকা অনন্তকাল যাবৎ মানুষকে ধর্ম ও কর্তব্যের শিক্ষা দেবে। এজন্য পুরাণকার বলেছেন তাঁর কীর্তি, তাঁর যশোগাথা শ্রবণ, পঠন, মনন করলে পাপ নষ্ট হয়--- কীর্তিং পাপহরাং বিধায় জগতাম্। স্বামীজী রামচন্দ্র সম্পর্কে বলেছেন— 'প্রাচীন বীরযুগের আদর্শ— সত্যপরায়ণতা ও নীতির সাকার মূর্তি, আদর্শ তনয়, আদর্শ পতি, আদর্শ পিতা, সর্বোপরি আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের চরিত্র অঙ্কন করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন।' [ভারতীয় মহাপুরুষগণ (মাদ্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতা) তথ্যসূত্র— স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, (শতবার্ষিকী সং), খণ্ড ৫ পৃষ্ঠা ১৪৮] পাপাত্মা, অধার্মিক রাবণকে হত্যা করে তার যথাযথ সৎকারাদি করে অযোধ্যায় ফিরে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার রাজ্যপাট গ্রহণ করলেন। ঋষিরা তাঁর রাজ্য শাসন প্রণালীকে ধর্মনিষ্ঠ রাজ্যশাসনের আদর্শ বলে প্রখ্যাপিত করলেন। রাজ্য শাসন বা প্রশাসনের একটি আদর্শ রূপের নাম দেওয়া হলো রামরাজ্য। রামরাজ্যকে যথার্থ ভাবেই হিন্দুরাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থার আদর্শ বলে তুলে ধরা চলে। কী এই রামরাজ্য? কী তার বৈশিষ্ট্য? বাল্মীকি রামায়ণে কয়েকটি শ্লোকের মাধ্যমে সূত্রাকারে এই রামরাজ্যের রূপটি তুলে ধরেছেন।

রামরাজ্যের এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

ন পর্যদেবন্ বিধবাঃ— বিধবারা দুঃখ করতেন না। বর্তমান প্রসঙ্গে বিধবা শব্দটি সমাজের অনাথ শ্রেণীর উপলক্ষণ। স্বয়ং নিজেদের ভরণ পোষণে সমর্থ নয় এমন ব্যক্তিগণ রামচন্দ্রের রাজ্যে দুঃখ ভোগ করতেন না। অর্থাৎ সমাজে তাদের কোনো দুঃখ কষ্ট ছিল না।

ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম্— বন্যপ্রাণীদের (ব্যাল=হস্তী/সর্প) থেকে ভয় ছিল না। অরণ্য সুসংরক্ষিত ছিল। বন্যপ্রাণীগণ গ্রামে বা জনপদে এসে উৎপাত করত না। তাদের প্রয়োজন অরণ্যেই পূর্ণ হোত। অপর দিকে নাগরিক ও গ্রামীণ মানুষ অরণ্যে অনুপ্রবেশ করত না। রামায়ণের সূক্ষ্ম অধ্যয়নে দেখা যায় যে, রাবণের রাজত্বকালে অরণ্যগুলি ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছিল। খর, দূষণ, শূর্পনখা প্রমুখ রাবণের অনুচরদের অত্যাচারে অরণ্যবাসী পশুপক্ষী, অরণ্যবাসী বনবন্ধু (বানর, ঋক্ষ, নিষাদ), তপোবনবাসী ঋষিরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। বাস্তবে গ্রাম ও নগর সংলগ্ন অরণ্যের অংশগুলিতে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি স্বরূপ ঋষিরা নিজেদের আশ্রমে সমাজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অধ্যয়ন, অধ্যাপন, সাধনা, যজ্ঞ প্রভৃতিতে রত থাকতেন। এই অনাসক্ত বিরক্ত ঋষি ও তাদের মার্গদর্শনে শিক্ষালাভকারী ব্রহ্মচারীদের থেকে প্রকৃতির কোনো ভয় ছিল না। অপর দিকে ভোগে আসক্ত নাগরিক ও গ্রামীণদের অনুচিত লোভ ও লালসার হাত থেকে অরণ্যগুলিকে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল বনবাসী বানর, ঋক্ষ, নিষাদ প্রভৃতি জনগোষ্ঠীগুলির। এরা অরণ্যেই নিজেদের জীবন যাপন করত এবং অরণ্য থেকেই নিজেদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করত। রামচন্দ্র রাবণকে বধ করার পরে অরণ্যে গুহকের নেতৃত্বাধীন নিষাদ, সুগ্রীবের নেতৃত্বাধীন বানর প্রভৃতিদের যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে অরণ্য সুরক্ষিত করেছিলেন।

ন ব্যাধিজং ভয়ম্— রোগ ব্যাধির থেকে ভয় ছিল না। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চমৎকার ছিল। পরিবেশ এবং মানুষের জীবনশৈলী সুন্দর ও পবিত্র হওয়ার কারণে কঠিন রোগের প্রকোপ বিশেষ ছিল না। মূলত দু'টি কারণে রোগ মানুষের ভয়ের কারণ হতে পারেনি। প্রথমত, কোনো রোগের মহামারীর আকার ধারণ করার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। দ্বিতীয়ত, রোগের চিকিৎসার সুব্যবস্থা ছিল। চিকিৎসা বাণিজ্যের সাধন ছিল না। চিকিৎসকদের সেবাপরায়ণতা এবং সদিচ্ছার মাধ্যমে প্রতি ব্যক্তিই যথাযথ চিকিৎসা লাভ করত। চিকিৎসার ক্ষেত্রে সকলের সমান সুযোগ ছিল। সেজন্যই ধনী দরিদ্র বৈষম্যের প্রশ্ন ছিল না। চিকিৎসার ক্ষেত্রে সকলের সমান সুযোগ ছিল। সেজন্যই রোগ ব্যাধি মানুষের ভয়ের কারণ হোত না।

নির্দস্যুঃ অভবৎ লোকঃ--- রাজ্যে দস্যুদের ভয় ছিল না। দস্যুবৃত্তির দু'টি কারণ— অভাব ও দুষ্ট ব্যক্তির লুণ্ঠন প্রবৃত্তি। সমাজে অভাব ছিল না। দুষ্ট লুণ্ঠনকারীদের কঠোর হাতে দমন করা হয়েছে। প্রশাসনের উপর যথেষ্ট নজরদারীর কারণে উৎকোচ গ্রহণকারী ও প্রজা পীড়নকারী সরকারি

অধিকারীরূপী দস্যুদেরও অত্যাচার সমাজে ছিল না। এই ব্যবস্থাটিকেই একাত্ম মানব দর্শনে অর্থের অভাব ও প্রভাব মুক্ত ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ন অনর্থঃ কশ্চিৎ অস্পৃশৎ বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকার্যাণি ন কুর্বতে— কাউকে কোনো অনর্থ স্পর্শ করত না। বৃদ্ধরা বালকদের শ্রাদ্ধ কার্য করতেন না। অর্থাৎ অকাল মৃত্যু সমাজের চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারেনি।

সর্বং মুদিতম্ এব আসীৎ, সর্বঃ ধর্মপরঃ অভবৎ, ন অভ্যহিংসন্ পরস্পরম্— সকলে আনন্দে ছিলেন, সকলেই ধর্মপরায়ণ ছিলেন। একে অপরকে হিংসা করতেন না। পারস্পরিক হিংসাশূন্য একটি সুন্দর সুষম ধর্মনিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। সমাজে পরস্পর ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল। সকলেই 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ' এই মন্ত্রকে সফল করার প্রয়াসে ব্রতী ছিলেন। সেজন্যই সকলে আনন্দে ছিলেন। সকলে আনন্দে ছিলেন তার কারণ সকলে ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সকলে ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং আনন্দে ছিলেন বলেই পারস্পরিক হিংসার ভাব উৎপন্ন হোত না।

বর্ষসহস্রাণি পুত্রসহস্রিণঃ— সহস্র পুত্রের সহিত মানুষ সহস্র বৎসর জীবনযাপন করত। সহস্র শব্দটি বহুত্বের প্রতীক। তাৎপর্য হলো মানুষ দীর্ঘায়ু ছিল। বহু প্রজা অর্থাৎ সন্ততির জন্ম দিয়ে তাদের লালন, পালন, শিক্ষা ও সংস্কারের মাধ্যমে সমাজকে প্রচুর সৎ নাগরিক সরবরাহ করার মতো প্রাচুর্য সমাজে ছিল। অস্বাভাবিক উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এর অর্থ হলো, মানুষ কেবল নিজের কামনা চরিতার্থ করার জন্য যথেচ্ছ সন্তানের জন্ম দিত না। বরং, ইন্দ্রিয় ও মনের সংযম পালন করত। অস্বাভাবিক উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এবং সেই সংক্রান্ত বিধিনিষেধ জারি করার প্রয়োজনীয়তাও ছিল না।

নিরাময়া বিশোকাশ্চ— মানুষ নিরাময় অর্থাৎ সুস্থ এবং বিশোক অর্থাৎ শোকরহিত হয়ে জীবন যাপন করত। নাগরিকদের শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা ছিল।

নিত্যপুষ্পাঃ নিত্যফলাঃ তরবঃ— সর্বদাই বৃক্ষে পুষ্প ও ফল থাকত। বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ঋতুতে ফল ও পুষ্প প্রদানকারী বিবিধ বৃক্ষে রাজ্য সুসজ্জিত ছিল। প্রকৃতিও অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিল। পরিবেশ যথাযথ ভাবে রক্ষিত হওয়ার কারণেই প্রকৃতি সুখপ্রদ হয়ে উঠেছিল।

কামবর্ষী চ পর্জন্যঃ সুখস্পর্শশ্চ মারুতঃ— মেঘ সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে বৃষ্টি দিত। বৃক্ষ ও অরণ্য সুসংরক্ষিত থাকার দরুন অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিজনিত কোনো সমস্যা ছিল না। সুখপ্রদ বায়ু প্রবাহিত হোত।

স্বকর্মণি প্রবর্তন্তে তুষ্টাঃ স্বৈরেব কর্মভিঃ, আসন্ প্রজাঃ ধর্মপরাঃ— প্রজারা সকলে নিজ নিজে কর্মে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং সেজন্য সকলে নিজ নিজ কর্মে লিপ্ত থাকতেন। সকলেই ধর্মপরায়ণ ছিলেন। অর্থাৎ, সমাজে সমস্ত কর্মের সঠিক মূল্যায়ন হোত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল না বলেই সকলে নিজ কর্মে সন্তুষ্ট ছিলেন। এই বৈষম্যের অভাবে, সামাজিক সমৃদ্ধির কারণে এবং স্যাজিক ব্যবস্থা ও ন্যায়ের প্রতি সকলের আস্থা থাকার কারণে সমাজে অধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটত না। অর্থাৎ সার্বিক ভাবে রামরাজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংকলিত করতে হলে বলা চলে রামরাজ্যের বৈশিষ্ট্য এইগুলি— সুস্থ প্রশাসন, উন্নততম স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা, আর্থিক সমৃদ্ধি, সমরস সমাজ, সাধারণ মানুষের সমুচ্চ নৈতিকতা, পরিবেশ রক্ষার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবস্থা।

প্রশাসক রূপে রাজারাম সর্বস্তরের মানুষ ছাড়াও বৃক্ষ, পশু, পক্ষী, অরণ্য বন্যপ্রাণী— সকলের প্রতি সমুচিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজ্য শাসন করেছিলেন যার একমাত্র ভিত্তি ছিল ধর্ম। এই ধরনের শাসনব্যবস্থা জগতে ভারতবর্ষ ছাড়া কোথাও সম্ভব নয়। এই শাসন ব্যবস্থা ধর্ম আধারিত শাসন ব্যবস্থা। ধর্ম হলো স্থিতপ্রজ্ঞতা, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, চৌর্যহীনতা, পবিত্রতা, মনঃসংযম, জ্ঞান, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ প্রভৃতি দৈবী সম্পদের মিলিত রূপ। রাজার ভূমিকা নিজে ধর্মপরায়ণ হয়ে অন্য সকলকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখা। হিন্দু শাস্ত্র বলছে, সর্বে ধর্মাঃ রাজধর্মে প্রতিষ্ঠিতাঃ। সমস্ত ধর্মই রাজধর্মে প্রতিষ্ঠিত। কারণ, রাজার প্রধানতম কর্তব্য হলো স্বয়ং ধর্মপরায়ণ হয়ে সকলকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখা। যদি রাজা এই কর্তব্য নির্বহণে অসফল হন তখনই সমস্ত ব্যবস্থার পতন ঘটে। রাজা রাম বিগ্রহবান ধর্ম। তিনি নিজে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে সমগ্র সমাজের সম্মুখে একটি অনুকরণীয় আদর্শ উপস্থাপন করেছিলেন এবং অসামান্য প্রশাসনিক দক্ষতা ও ন্যায়ের আধারে সমস্ত সমাজকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমাজে অর্থের অভাব বা প্রভাব কোনোটিই ছিল না। একমাত্র এই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাতেই মানুষের এবং জগতের কল্যাণ সম্ভব।

রামরাজ্যে শাসন ব্যবস্থা রাজতান্ত্রিক হলেও বাস্তবিক অর্থে রামরাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। একজন ধোপার কথায় একপত্নীব্রতে স্থিত রামচন্দ্র নিজের রাজধর্ম পালন করার জন্য প্রাণাধিক প্রিয়া সীতাকে পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন। সকলের ন্যায় প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। গান্ধীজী তার রামরাজ্য সংক্রান্ত ধারণায় বলেছেন, ''The ancient ideal of Ramarajya is undoubtedly one of true democracy in which the meanest citizen could be sure of swift justice without an elaborate and costly procedure'' (রামরাজ্যের প্রাচীন আদর্শটি নিঃসন্দেহে একটি সুস্থ গণতন্ত্রের আদর্শ যেখানে তুচ্ছতম নাগরিকও দীর্ঘকালিক এবং মহার্ঘ প্রক্রিয়ার আড়ম্বর ছাড়া সহজে ন্যায়বিচার পাবে) (Young India, 19/09/1929)

সকলের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যই হলো রামরাজ্যের বৈশিষ্ট্য। গান্ধীজীর মতে, ''Ramarajya of my dream ensures equal rights alike of prince and pauper.'' (আমার স্বপ্নের রামরাজ্যে রাজা ও ভিক্ষুকের সমান অধিকার থাকবে) (Amrita Bajar Patrika 2/8/1934)

স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতবর্ষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়, ভাবনা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় একাত্মতা এবং ব্যক্তির মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে নাগরিকদের পারস্পরিক ভ্রাতৃভাবের দৃঢ়ীকরণের

কথা বলা হয়েছে। রামায়ণ বর্ণিত রামরাজ্যের বিবরণেও আমরা দেখি ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মনিষ্ঠ শাসনব্যবস্থা। বৈভবসম্পন্ন সমাজ রামরাজ্যের বৈশিষ্ট্য। পরিশুদ্ধ প্রেমের আধারে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সমরসতা। নাগরিকদের পারস্পরিক হিংসারহিত ভ্রাতৃভাব। পরিশুদ্ধ প্রেমের আধারে রাজারামের সঙ্গে নিষাদ প্রভৃতি বনবন্ধুদের নিখাদ বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় একাত্মতার প্রতিষ্ঠা।

ব্যবস্থা ও তত্ত্ব যদি একে অপরের সঙ্গে না মেলে তবে সেই ব্যবস্থা ও সেই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পায় না। তত্ত্বকে ব্যবহারিক হতে হবে এবং ব্যবহারকে তত্ত্বনিষ্ঠ হতে হবে। তত্ত্ব যদি ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে তবে সেই তত্ত্বের বিকৃত ক্রমবিকাশ মানব সভ্যতার ভয়ানক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। চীন, রাশিয়া, কাম্পুচিয়া, উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলিতে তাত্ত্বিক সমাজতন্ত্রের রক্তাক্ত ইতিহাস এবং এশিয়া, আফ্রিকা-সহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার নগ্ন শোষণজনিত দারিদ্র্যই এর প্রমাণ। অন্যদিকে যে ব্যবস্থার তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা নেই সেই ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। জগতের কল্যাণের উদ্দেশে কঠোর তপস্যায় নিরত ঋষিরা তত্ত্ব ও ব্যবস্থার মধ্যে যে অদ্ভুত মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্র সেই তত্ত্বনিষ্ঠ ব্যবস্থাকে বাস্তবিকতার রূপ দিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের চিরন্তন প্রার্থনা— সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। রামরাজ্যে সকলে আনন্দে ছিলেন (সর্বং মুদিতম্ এব আসীৎ) এবং সকলে নিরাময় ছিলেন (নিরাময়া বিশোকাশ্চ)।

বাস্তবিক অর্থে রামরাজ্যের বিরোধিতা করার অর্থ প্রকারান্তরে ভারতবর্ষের সংবিধানের বিরোধিতা— ভারতীয় ঐতিহ্যের বিরোধিতা। স্বাধীন ভারতবর্ষে যে ন্যায়, সাম্য ও একাত্মতার স্বপ্ন ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দ দেখেছিলেন সেই স্বপ্নের আদর্শ বাস্তবিক রূপটিই হলো রামরাজ্য। কারণ, ধর্মের আধারে গঠিত সার্বভৌম সমাজই রামরাজ্যের সার কথা। গান্ধীজীর শব্দে "Ramrajya i.e. sovereignty of the people based on pure moral authority" (রামরাজ্য হলো বিশুদ্ধ নৈতিকতার আধারে জনতার সার্বভৌমত্ব) (Harijan 2/1/1937)

তথ্যসূত্র :

বাল্মীকীয় রামায়ণ (দাক্ষিণাত্য সংস্করণ) যুদ্ধকাণ্ড, ১২৮ অধ্যায়ের ৯৭-১০৩ শ্লোক। শ্লোকগুলি রামায়ণের তিনটি প্রধান সংস্করণ অর্থাৎ বঙ্গীয় সংস্করণ এবং পশ্চিমী সংস্করণেও অল্প কিছু পাঠভেদ-সহ পাওয়া যায়। শ্লোক সংখ্যায় কিছু পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু শ্লোকগুলি প্রতিটি সংস্করণেই বর্তমান। এমনকী বেদব্যাস রচিত ব্রহ্মপুরাণান্তর্গত অধ্যাত্মরামায়ণে এবং অন্যান্য রামায়ণেও এই শ্লোকগুলি পাওয়া যায়।

(লেখক : অধ্যাপক, সংস্কৃত অধ্যয়ন বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, বেলুড় মঠ, হাওড়া)

হিন্দু মুনিঋষিদের পরিচয়

রবীন সেনগুপ্ত

সনাতন হিন্দু ধর্মের আদিযুগের মুনিঋষিদের মধ্যে মহর্ষি বশিষ্ঠ, মহর্ষি কশ্যপ, দেবর্ষি নারদ ও বাল্মীকি মুনির নাম সবচেয়ে পরিচিত। পরবর্তীকালে বেদব্যাস, ভৃগু, চ্যবন, লোমশ, দুর্বাসা, ভরদ্বাজ প্রমুখ মুনিও বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ভারতের আদি রাজবংশ সূর্যবংশের গুরু ছিলেন বশিষ্ঠ। সূর্যবংশেই ভগবান রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং মহর্ষি বশিষ্ঠ ছিলেন শ্রীরামের কুলগুরু। আর কশ্যপ মুনির দুই স্ত্রী— দিতির গর্ভে দানব ও অদিতির গর্ভে দেবতারা জন্মগ্রহণ করেন। কাশ্যপ গোত্রের পরিবারের সংখ্যাও ভারতে সর্বাধিক। রামায়ণ ও মহাভারতের রচনাকার রূপে বাল্মীকি ও বেদব্যাস মুনি খ্যাতি পেয়েছেন। বেদব্যাসের পিতা পরাশর মুনি। বেদব্যাস পুত্র শুকদেব। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য। দেবগুরু বৃহস্পতি। শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাগুরু সান্দীপনি মুনি ও দীক্ষাগুরু উপমন্যু প্রমুখ ঋষিও স্ব-মহিমায় ভাস্বর। শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রাশনে পৌরোহিত্য করেন গর্গমুনি।

মার্কণ্ডেয় মুনি আর লোমশ মুনি দীর্ঘ আয়ুর জন্য বিখ্যাত। রাবণের পিতা বিশ্রবা মুনি ও পিতামহ রূপে পুলস্ত মুনিকে বহুজনে চেনেন। আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা রূপে মহর্ষি ধন্বন্তরীর যথেষ্ট খ্যাতি আছে বিশ্বজুড়ে। ক্রোধী ঋষি রূপে দুর্বাসাকে সকলেই মনে রাখেন।

বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র অত্রিমুনির আশ্রমে অবস্থান করেছিলেন। অগস্ত্য মুনির জন্য বিন্ধ্যপর্বত নতজানু হয়েছিলেন। বেদব্যাস রচিত পুরাণগুলিকে সমাজে প্রচলিত করার ব্যাপারে সৌতীমুনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নর ও নারায়ণ মুনির মাধ্যমেই পুরাণের বহু ঘটনা বেদব্যাস জানতে পারেন। গঙ্গাসাগর আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা কপিল মুনিও বিখ্যাত এদেশে।

পুনর্মূষিক ভব— সেই মূষিকের ব্যাঘ্রে রূপান্তরের বিখ্যাত ঘটনাটি ঘটেছিল গৌতম মুনির সৌজন্যে। পুলহ, মরিচ, অঙ্গিরা প্রমুখ সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষির পর্যায়ভুক্ত। নাট্যাচার্য্য রূপে ভরতমুনিও সুপরিচিত।

এছাড়াও আরো যেসব ঋষির নাম বেদ-বেদান্ত-পুরাণের নানা শাখায় পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন— শাণ্ডিল্য মুনি, হিরণ্য মুনি, কৌশিক মুনি, দেবল মুনি, মৌদগল্য মুনি, সনৎকুমার, শমীক মুনি, জৈমিনি মুনি, ক্রতু মুনি, পঞ্চশিখ মুনি, শক্তি মুনি, কণ্ব মুনি, আলিম্বান মুনি, সোমক মুনি, পিপ্পীলাদ মুনি প্রমুখ।

এঁদের অনেকের নামে গোত্র প্রচলিত রয়েছে আজও। পূজা ও শ্রাদ্ধের সময় হিন্দুরা এই গোত্রগুলির নাম পুরোহিতদের কাছে বলে থাকেন। ■

মহিলা ক্ষমতায়ণের পথে মুসলমান নারী

সুতপা বসাক ভড়

দেশ স্বাধীন হবার সময় থেকে আমরা আত্মতুষ্টিতে ভুগতে শুরু করলাম যে, আমরা স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু এই আমরা কারা? ভারতের মোট জনসংখ্যার শিশু, বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী যুবক- যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এদের মধ্যে কত শতাংশ স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েছে? সত্যিই কি ১০০ শতাংশ ভারতবাসী আজ স্বাধীন? তাই যদি হোত, তাহলে সমাজে এত সমস্যাই থাকত না। অনেক পরিবারেই মেয়েরা এখনও পরাধীন বাড়ির পুরুষ সদস্যদের কাছে। কেউ আর্থিকভাবে, কেউ শারীরিক বা মানসিকভাবে। ব্যক্তিস্বাধীনতার নাম পর্যন্ত শোনেনি— এমন মহিলাদের সংখ্যাও প্রচুর। এরা যেন জন্মে থেকেই জেনে যায় যে, তারা মেয়ে। সবার সব হলে যদি কিছু থাকে, তবে তাদের জন্য কিছু জুটবে। এদের মধ্যে মুসলমান মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। অথচ তাদের দুরবস্থার কথা প্রকাশ্যে বলা যাবে না। তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য কোনো তথাকথিত সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা মুখ খুলবেন না। কারণটা একদম স্পষ্ট— মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক। বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল এই মুসলমান ভোটব্যাঙ্ককে নিজেদের ভাগে পেতে চায়। তবে ব্যতিক্রম সবসময়েই থাকে, এক্ষেত্রেও আছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মুসলমান মহিলাদের পিছিয়ে থাকার ব্যাপারে তাদের মধ্যে শিক্ষার অভাবকে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। পড়াশুনা এবং কৌশল বিকাশ যোজনার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ণের পথে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। এছাড়া, এই সরকার মুসলমান সমাজের তিন-তালাকের মতো জঘন্য প্রথাকে সমূলে বিনাশ করতেও বদ্ধপরিকর। কেন্দ্রীয় সরকারের নারী-ক্ষমতায়ণের এই সব পদক্ষেপ অনেক রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবীর ভাল লাগেনি, অনেকে প্রকাশ্যে এর বিরুদ্ধাচরণও করেছেন। মুসলমান সমাজের মহিলারা কেন্দ্রীয় সরকারের এইসব পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে, ভোট দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, নারী ক্ষমতায়ণের পথের সৈনিক তাঁরাও।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, মৌলানা আজাদ ফাউন্ডেশন সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রালয়ের স্বায়ত্তশাসিত, বিনালাভে চলে এমন একটি সংখ্যালঘুদের কল্যাণ সংস্থা। সংখ্যালঘু বিষয়ক রাজ্যমন্ত্রী মুখতার আব্বাস নক্‌ভি জানিয়েছেন যে, এই ফাউন্ডেশনটি মুসলমান মেয়েদের জন্য বেগম হজরত মহল রাষ্ট্রীয় ছাত্রবৃত্তি এবং গরিব নমাজ কৌশল বিকাশ কেন্দ্রের মতো বিভিন্ন যোজনার মাধ্যমে লাভবান মেয়েদের সংখ্যা বাড়াতে চান। বর্তমানে বেগম হজরত যোজনার মাধ্যমে কুড়ি হাজার মেয়েরা লাভান্বিত হচ্ছে এবং এই বছরে এই সংস্থা বাড়িয়ে পঁয়তাল্লিশ হাজার করতে চান। আগামী বছর যাতে পাঁচ লক্ষ বিদ্যার্থী এই যোজনার মাধ্যমে লাভান্বিত হতে পারে, সেই চেষ্টা করা হবে।

এদিকে, তিন-তালাক বন্ধ করার ব্যাপারে মুসলমান মহিলারা কেন্দ্র সরকারকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন। সম্প্রতি, দিল্লির কনস্টিটিউশান ক্লাবে মুসলিম ওয়েলফেয়ার মঞ্চ দ্বারা আয়োজিত মুসলিম মহিলা সম্মেলনে প্রথমবার কয়েক শো মুসলমান মহিলা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং সবার জন্য সমান শিক্ষার অধিকার ও আর্থিক স্ব-নির্ভরতার ওপর জোর দিয়েছেন। সম্মেলনে ভারত-মাতার জয়ধ্বনি করা হয় এবং বন্দে মাতরম্ গান গাওয়া হয়। মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের মহিলা শাখার রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ গাজনার হুসেন জানিয়েছেন যে, উত্তরপ্রদেশে কীভাবে মুসলমান বোনেরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমাদের সমাজে মহিলারা তিন-তালাক নিয়ে সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকেন, না-জানি কখন তাদের তালাক-তালাক বলে বের করে দেওয়া হবে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের এই দুরবস্থা নির্মূল করতে সচেষ্ট হয়েছে। এতে তাদের উৎসাহ বেড়েছে।

সম্মেলনে উপস্থিত সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডিশনাল সলিসিটার জেনারেল পিঙ্কী আনন্দের থেকে মহিলারা আইনসংক্রান্ত নানান বিষয়ে জানতে চান। মুসলিম ওয়েলফেয়ার মঞ্চের সংযোজক যাসির জিলানী মন্তব্য করেন যে, মুসলিম মহিলার তিন-তালাককে সমর্থন করে না এবং এই বিষয়ে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন করেন। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা দরক্ষা বলেছেন যে, মুসলমান সমাজের সব থেকে বড় সমস্যা হলো শিক্ষার প্রতি সচেতন না হওয়া। ইসলামিক পণ্ডিত এবং সমাজসেবী সাঈমা নিজামি বলেছেন, আমাদের লক্ষ্য আমরাই তৈরি করব। দিল্লির যুবা-সামাজিক কার্যকর্তা সনা খান জানিয়েছেন যে, মুসলমান সমাজে ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। ভাইকে লেখা-পড়া শেখানোর জন্য বোনের পড়াশুনা বন্ধ করে দেওয়া হয় আর অল্প বয়সেই তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়।

মুসলমান পণ্ডিতদের বক্তব্য, মুসলমান সমাজের মহিলাদের মধ্যে সচেতন বাড়ছে। তারা ভোটব্যাঙ্ক বোঝে না। সেজন্য যে রাজনৈতিক দল তাদের ক্ষমতায়ণের জন্য যোজনা বদ্ধভাবে কাজ করছে, তাদের বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করছে, তাদেরই পক্ষেই মহিলারা থাকছেন। আজকের মুসলমান মহিলারা সচেতন হয়েছেন এবং মহিলা ক্ষমতায়ণের পথের পথিক তাঁরাও। ■

ক্যানসার রোগী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

সাধারণ মানুষের ধারণা ক্যানসার মানে মৃত্যু। হ্যাঁ, একথা সত্য আমাদের দেশে অনেক মানুষ ক্যানসারে মারা যান। যখন প্রথম জানা যায় রোগী ক্যানসারে আক্রান্ত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিজনেরা এতে মানসিক ভাবে খুব ভেঙে পড়েন। এর ফলে আসে নানা চিন্তা—যেমন চিকিৎসা করে কোনো ফল হবে কিনা, চিকিৎসার খরচ ইত্যাদি। এমতাবস্থায় আত্মীয় পরিজনদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে থাকে একদল দালালও। অনেকের হয়তো জানা নেই এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা এই রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে রোগী নিয়ে যান টাকার বিনিময়ে। ভিন রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা আমাদের রাজ্যের চেয়ে ভাল এমন একটা ধারণা অনেকের আছে। একথাও ঠিক যে ভারতের বেশ কিছু রাজ্যে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা আছে। আমার দীর্ঘ ত্রিশ বছরের চিকিৎসা জীবনে দেখেছি আধুনিক চিকিৎসায় পাঁচ বছর ভাল থাকলেই অসুখ সেরে গেছে ধরে নেওয়া হয়। অথচ হোমিওপ্যাথিতে যদি এইরকম ঘটনা ঘটে সেটা এমনি এমনিই হয়েছে বা রোগীর মনের জোরে হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

এখনও পর্যন্ত সারা বিশ্বেই ক্যানসার পুরোপুরি সারিয়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। পৃথিবীব্যাপী ক্যানসার চর্চা চলেছে বিজ্ঞানভিত্তিক- ভাবে। ভাইরাল অঙ্কোলজি নামে ক্যানসার শাস্ত্রের একটা শাখা আজও প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু অনেকের মতে শাখাটি মৃতপ্রায়। কারণ মূল প্রশ্ন হলো ক্যানসার কি জীবাণু ঘটিত সংক্রামক রোগ? প্রচারের ফলে এমন আতঙ্ক ছড়িয়েছে যে, রোগীটির নিকটতম আত্মীয়রাও তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। এ যদি তেমন রোগই হয়, তাহলে তো মহিলাদের উচিত এই ক্যানসারের কবলে পড়লে প্রথমেই তাঁদের স্বামী তথা পুরুষসঙ্গীর বিরুদ্ধে মামলা করা। কারণ হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসটা পুরুষের যৌনাঙ্গেই থাকে এবং সহবাসের ফলেই তা মহিলাদের শরীরে চলে আসে।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হয় মহিলারা যেন বড্ড বিপদের মধ্যে আছেন। আবার যদি অবিবাহিত থাকেন, তাহলে নাকি স্তন ক্যানসারের কবলে পড়বেন। আর যদি বিবাহ করেন তাহলে দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকে জরায়ু মুখের ক্যানসার। পুরুষরাও অবশ্য নিরাপদ নয়। তাঁদের যৌনাঙ্গেও ভাইরাস, শিশ্নদেশ এবং প্রসেস্ট ক্যানসারের কারণ নাকি এই ভাইরাসটা।

এইচ. পি. ভি. ভাইরাস ১০০ প্রকারের। এরা সাধারণত নিরীহ চরিত্রের এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো চিকিৎসা ছাড়াই যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে, তেমনভাবেই তারা স্থান ত্যাগ করে। কিন্তু এদের মধ্যে প্রায় ৩০ প্রকার ভাইরাস আছে, যারা ওভাবে স্থান ত্যাগ করে না। তারা জরায়ু মুখের কোষগুলির ক্ষতিসাধন করতে পারে। তাতে রোগও হতে পারে। যেমন প্যাপিলোমার মধ্যে ক্যানসারের কোনো সম্পর্ক নেই। তাছাড়া যেসব মহিলাদের জরায়ু মুখের ক্যানসার দেখা যায়, তাঁদের সকলের মধ্যে এই ভাইরাসটা পাওয়া যায় না।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিক আর উল্টোদিকে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে খণ্ডতাবাদের উপর। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় আধুনিক ক্যানসারবিজ্ঞানে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবটা আছেই। দ্বিতীয়ত, অনেকে এও মনে করেন যে আধুনিক চিকিৎসার জনপ্রিয় পদ্ধতিগুলো, যেমন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, পরিসংখ্যান ইত্যাদির পেছনেও হোমিওপাথির ঐতিহাসিক অবদান আছে এবং এছাড়া 'বিষে বিষে বিষক্ষয়' হোমিওপ্যাথির মূলনীতি। সেই নীতি আধুনিক কেমোথেরাপিতেও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

অনেকে বলেন হোমিওপ্যাথিতে যদি আদৌ কোনো উপকার হয়, তবে তা কেবল মানসিক শান্তি তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

কিন্তু তাও তো প্রয়োজন। আমাদের আধুনিক চিকিৎসার নির্লিপ্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশ থেকে যদি একটু মানসিক শান্তিও মেলে তাই কম কী? আমি ত্রিশ বছর হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করে দেখেছি। শরীর আর মনের এক পবিত্র আধ্যাত্মিক সমন্বয় ঘটিয়ে, ইমিউনিটির ব্যাপারটা ঠিকঠাক করে দিতে পারলে ক্যানসার জনিত ক্ষত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ক্যানসার চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনির্দিষ্টকাল ব্যাপী মনকে শক্ত রেখে রোগীর সেবা করতে করতে তৈরি হয় যে মানসিক চাপ, বিশেষত যে সমস্ত রোগীর মূল সমস্যা অসম্ভব যন্ত্রণা, সেই মানসিক চাপ থেকে অনেক ক্ষেত্রেই জন্ম নেয় অবসাদ। এই সমস্যাগুলি বাড়তেই থাকে কারণ যিনি রোগীর সেবা করছেন, তিনি নিজের দিকে মনোযোগ দিতে পারেন না এবং তাঁর দেখাশোনা করার কেউ থাকে না। সেজন্য সেবিকার সামাজিক কাজকর্মও ব্যাহত হয়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে পারিবারিক অশান্তিও দেখা যায়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের ক্যানসার হলে কখনও কখনও দাম্পত্য জীবনেও সমস্যা দেখা দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাহত হয় স্বাভাবিক যৌনজীবন। একটা সময়ের পর এই মানসিক যন্ত্রণাগুলির বহিঃপ্রকাশ হতে থাকে রাগ, ক্ষোভ আর সঙ্গে ক্লান্তি হতাশায় নষ্ট হয়ে যায় বেঁচে থাকার ইচ্ছে। কে এই সমস্যার শিকার হবেন তা কিছুটা নির্ভর করে সেবক/সেবিকার মানসিক জীবনের উপরও।

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এক্ষেত্রে মহিলারা এবং অল্পবয়স্ক সেবক/সেবিকারা বেশি সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হন। শুধু মানসিক বাধাই নয় বেশ কিছু শারীরিক সমস্যাও দেখা যায়। এর সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা, নিদ্রাহীনতা, পেটের সমস্যা, রক্তচাপ বৃদ্ধি, হৃদ্‌রোগের সমস্যা ইত্যাদি। পরিবারের প্রধানের ক্যানসারের কারণে কর্মহীনতা এবং মৃত্যুর ফলে অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক আর্থিক সঙ্কট ডেকে আনে।

এখন বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে ক্যানসার বংশগত একটি রোগ। এক্ষেত্রে ক্যানসার রোগীর ভাবী প্রজন্মকে হোমিওপ্যাথিক ধাতুগত চিকিৎসা করালে অনেকটা ক্যানসার প্রতিরোধ সম্ভব। এছাড়া ক্যানসারের রোগী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

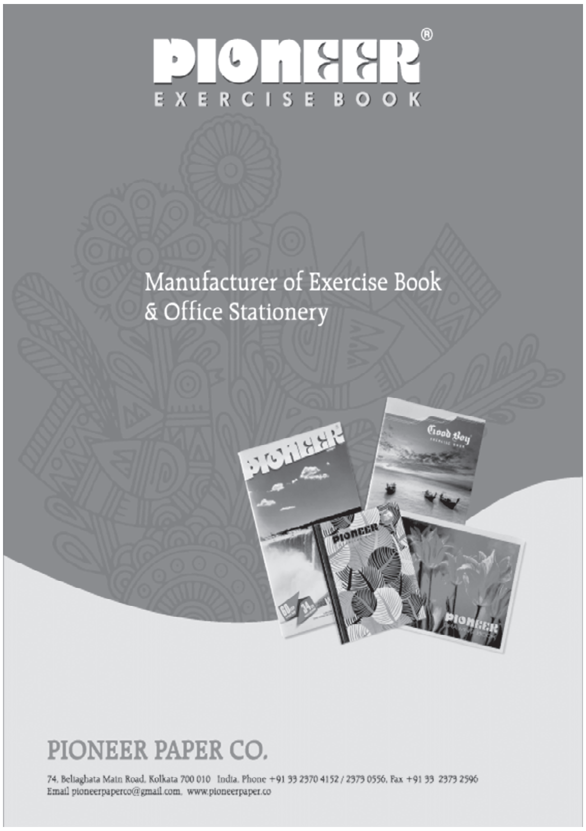

“সনাতন ধর্মে যে মহান ঐশ্বর্য আমাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল, রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দের মহাজীবনে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখে আমরা হিন্দুরা অকস্মাৎ সে বিষয়ে সচেতন হয়েছি।
অতএব আমাদের এখন অপরূপ সরলভাবে হিন্দুধর্মের আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সেই আদর্শ কি, যদি প্রশ্ন করি, তবে বলা যায়— আমরা কি আমাদের সম্মুখে (এ বিষয়ে) দুটি দৃষ্টান্ত পাইনি, যাঁদের জীবনে এই আদর্শ মূর্ত হয়েছে এবং যাঁদের পদচিহ্ন আমরা অনুসরণ করতে পারি?”

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

এশিয়াকাপে ভারতের পারফরমেন্সের সালতামামি

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

এশিয়ান কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের যোগ্যতা নির্ধারণী পর্বের খেলা চলছে। ভারত টুর্নামেন্ট অভিযান শুরু করেছে প্রথম ম্যাচে মায়ানমারকে হারিয়ে। এরপর কাজাখাস্থান ও ম্যাকাওয়ের বিরুদ্ধে খেলতে হবে সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলকে। বর্তমানে ভারতের ফিফা র‍্যাঙ্কিং ৯৭। বহু বছর পরে একশোটি দেশের মধ্যে স্থান পেয়েছে ভারত। কাজাখাস্থান ও ম্যাকাওকে হারাতে পারলে এশিয়াকাপের মূলপর্বে যেমন খেলতে পারবে তেমনি ফিফা র‍্যাঙ্কিংও আরো উন্নত হবে। তাই পাখির চোখ এশিয়াকাপ। ২৭ মে ১৯৬৪, প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর জীবনাবসান হলো। সেদিনই দেশ থেকে অনেক দূরে ইজরায়েলের তেল আভিভে দশ হাজার দর্শকের সামনে কালো ব্যাজ পরে ভারতীয় ফুটবল দল দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে খেলতে নামল। এশিয়ান কাপের খেলা, ভারতের অধিনায়ক চুনি গোস্বামী। দক্ষিণ কোরিয়া দূরন্ত দল। একে এশিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ন, তার ওপর ২ বছর আগে জাকার্তা এশিয়াডের ফাইনালে ভারতের কাছে হার স্বীকার করেছে। তাই এশিয়ান কাপে ভারতকে হারাতে সর্বশক্তি দিয়ে মাঠে ঝাপিয়ে পড়ল কোরিয়ানরা। কিন্তু এবারও তাদের স্বপ্নপূরণ হলো না। ভারত আরো উন্নত ফুটবল খেলে ২ গোলে ম্যাচ জিতল। ভারতের হয়ে গোল দুটি করেন ইন্দার সিংহ ও আপ্পালারাজু। সর্ব বিভাগে ভারত কোরিয়ানদের মাঠে পর্যদুস্ত করে ছেড়েছিল।

সেবার এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলে চারটি দেশ। প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ কোয়ালিফাইং রাউন্ডে তুল্যমূল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ভারত দক্ষিণ কোরিয়া, ইজরায়েল ও ইরান উঠে এসেছিল মূল পর্বে। তখন এশিয় পর্যায়ে এই চারটি দেশই ছিল সব সেরা। আর ছিল জাপান। তারা একটুর জন্য কোয়ালিফাই করতে পারেনি। ভারত চার দেশের রাউন্ড রবিন ভিত্তিক টুর্নামেন্টে দক্ষিণ কোরিয়া, ইরানকে হারিয়েছিল। আর ইজরায়েলের সঙ্গে ম্যাচটি ড্র হয়েছিল। ইজরায়েল ও ভারত গ্রুপে এক ও দু' নম্বর হয়ে ফাইনালে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। তৃতীয় স্থান পেয়েছিল ইরান।

ফাইনালে স্বদেশবাসীর সামনে প্রথম থেকেই তেড়েফুঁড়ে খেলে ম্যাচের ওপর কৃতিত্বের রাশ বিছিয়ে দিয়েছিল ইজরায়েল। তবে দ্বিতীয় পর্বে ভারতও বিক্ষিপ্তভাবে বেশ কিছু আক্রমণ তুলে এনেছিল ইজরায়েলের বক্সে। যদিও তাদের গোলকিপার অনবদ্য খেলে ভারতকে গোল করা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। অত্যন্ত দ্রুতগতির খেলায় আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণে দর্শকরা প্রভূত আনন্দ ও উত্তেজনার খোরাক পেয়েছিলেন। মিডফিল্ডার প্রশান্ত সিনহার একটি শক্তিশালী দূরপাল্লার শট বিপক্ষ গোলকিপারকে পরাস্ত করে বারপোস্টে লেগে ফিরে আসে মাঝমাঠে। সেই বল ধরে প্রতি

চুনি গোস্বামী (বাঁ দিকে)

আক্রমণ থেকে গোল করে যায় ইজরায়েল। এশিয়ান গেমসের স্বর্ণপদকজয়ী ভারত একটুর জন্য এশিয়ান কাপে জিতে 'ডাবল' করতে পারেনি।

এবারে আসা যাক এশিয়ানকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের শুরুর কথায়। ১৯৫২ সালে হেলিসিংকি অলিম্পিক্সের পর এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন ইউরোপীয় ধাঁচে এই মহাদেশের দলগুলিকে নিয়ে ফুটবল টুর্নামেন্টের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এটা তার দু'বছর পর বাস্তবায়িত হয়। ৫৬ সালে প্রথম এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয় ফিফার সর্বাত্মক অনুমোদন ও সহযোগিতার মাধ্যমে। প্রথমবারের টুর্নামেন্টে সরাসরি মূল পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হয় সাতটি দেশকে নিয়ে। ভারত সেবার যোগ দেয়নি। প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া। ইজরায়েল হয়েছিল রানার্স। ৫০ সালের টুর্নামেন্টে তিনটি জোনে খেলা হয়েছিল। ভারত, সিঙ্গাপুর এবং ফিলিপাইনসে।

প্রথম আত্মপ্রকাশের লগ্নটি অবশ্য ভারতের পক্ষে স্মরণীয় হয়নি। ইজরায়েল, ইরানের বিরুদ্ধে হার স্বীকার করতে হয়েছিল ভারতকে। ভারতকে টপকে পাকিস্তান পেয়ে গেছিল তৃতীয় স্থান। ৬৪ সালে দল বেড়ে হয়েছিল ১৬টি। ৬৮ সালে ইরানের রাজধানী তেহেরানে ইরান চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ভারত পেয়েছিল পঞ্চম স্থান। ৭২ সালে আরব দেশগুলি ঢুকল এই টুর্নামেন্টে। ব্যাঙ্ককের ওই আসরে ইরান চ্যাম্পিয়ন, রানার্স দক্ষিণ কোরিয়া। এরপর থেকে প্রতিটি এশিয়ান কাপে হয় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি, নয়তো জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যেই চ্যাম্পিয়নশিপ সীমাবদ্ধ থেকেছে। ভারত সাম্প্রতিককালে এশিয়াকাপে তেমন বলার মতো পারফরমেন্স মেলে ধরতে পারেনি। কেবল ২০১১-র এশিয়ান কাপে মূলপর্বে ওঠার এবং ২০০৮-য়ে দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান কাপ চ্যালেঞ্জার্স টুর্নামেন্টে তুর্কমেনিস্থানকে ফাইনালে পর্যদুস্ত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়া। এশিয় পর্যায়ে এটাই ভারতের সেরা ফলাফল।

নবাঙ্কুর

মস্তিষ্কের ক্রিয়া

আমাদের মস্তিষ্কের দু'টি অংশ। একটি ডান অংশ ও একটি বাম অংশ। এই দুটি অংশের কাজ দু'রকমের। ডানদিক আবেগ প্রবণ এবং বামদিক যুক্তিবাদী।

যে সমস্ত মানুষের ডানদিক বেশি সক্রিয় তাঁরা আবেগ প্রবণ, কল্পনা প্রবণ, স্বপ্ন বিলাসী, শিল্পকলা বা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হয়। যদি দেখা যায় কোনো শিশু বা ছাত্র পড়াশুনার থেকে বইয়ের ছবিগুলির প্রতি বেশি মনোযোগী, বই খুলে জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে বেশি আগ্রহী, অঙ্ক কষার জায়গায় ছবি আঁকায় উৎসাহ বেশি, বিজ্ঞান ভুগোল ছেড়ে কবিতা, গান পড়ে বেশি আনন্দ পায় তাহলে বুঝতে হবে যে ওই শিশু বা ছাত্রের মস্তিষ্কের ডান দিকের অংশ বেশি সক্রিয়।

যদি দেখা যায়, কোনো ছাত্র অঙ্ক, বিজ্ঞানে বেশি আগ্রহী, চিন্তা ভাবনায় সব সময় যুক্তিবাদী, সর্বদাই লাভ লোকসান হিসেব করে চলে, ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন, তাহলে বুঝতে হবে যে ওই শিশু বা ছাত্রের মস্তিষ্কের বাঁ দিকের অংশ বেশি সক্রিয়।

প্রত্যেক শিশুরই মস্তিষ্কের দুই অংশই কম বেশি সক্রিয় থাকে। পরিবেশের প্রভাব, শিক্ষকের প্রভাব, বাবা মায়ের প্রভাব, সর্বোপরি সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভাব, কর্ম মস্তিষ্ক বা যুক্তিবাদী মস্তিষ্ক বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। বাম মস্তিষ্কের অধিকারীরা হয়ে ওঠে দক্ষ প্রশাসক। দক্ষ নেতা, দক্ষ উকিল, ব্যারিস্টার বা শিল্পপতি।

বাম মস্তিষ্কের অধিকারী ব্যক্তিরা যদি ডাক্তার হন তাহলে তারা রোগের গভীরে ঢুকে রোগের কারণ ও তার নিরাময়ের উপায় খোঁজেন। যদি ইঞ্জিনিয়ার হন, তাহলে স্থাপত্য, ভাস্কর্য বা ডিজাইনের প্রতি মনযোগী হন সমস্যার গভীরে ঢুকে বিশ্লেষণ করে নতুন স্থাপত্য, ভাস্কর্য বা ডিজাইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনে সক্ষম হন। শিল্পসাহিত্যের সমঝদার তাঁরা হন ঠিকই কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তি তত থাকে না।

যদি দেখা যায় কোনো ছাত্র পড়তে বসে বাইরের দিকে হাঁ করে বৃষ্টি দেখছে, কিংবা অঙ্কের খাতা নিয়ে অঙ্কের জায়গায় ছবি আঁকছে, লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখছে বা অন্যমনস্ক হয়ে কল্পনার জগতে বিচরণ করছে, তেমন ছাত্রকে বাবা মা বা মাস্টারমশাই উৎসাহিত করবেন না, বকাঝকা করবেন। এর ফলেই মস্তিষ্কের ডান দিকের সক্রিয়তা নষ্ট হয় এবং ধীরে ধীরে বেড়ে যেতে থাকে বাম অংশের ক্রিয়া।

নতুন কিছু সৃষ্টি করার বা উদ্ভাবন করার ক্ষমতা কিন্তু এই ডানদিক সক্রিয়দেরই থাকে। তাই মনোবিজ্ঞানী সমাজ বিজ্ঞানী সর্বোপরি আমাদের রাষ্ট্র প্রধানরা ডানদিক সক্রিয় মস্তিষ্কের অধিকারীদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন এবং ডান অংশকে সক্রিয় করার পরিবেশ রচনায় জোর দিচ্ছেন।

বিধানচন্দ্র আখুলি

ভারতের পথে পথে

ঝাঁসি

ঝাঁসি ও রানি লক্ষ্মীবাঈ একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বলতে গেলে তাঁর জন্যই ঝাঁসি ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয়। ইংরেজ সরকার বিভিন্ন অজুহাতে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিকে দখল করছিল। ঝাঁসির রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যুর পর ইংরেজরা হাত বাড়ায় ঝাঁসির দিকে। দত্তক পুত্র দামোদর রাওকে রাজ্যের উত্তরসূরী মানতে অস্বীকার করে তারা। তখন ঝাঁসিকে রক্ষা করতে তরবারি হাতে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পরেন রানি লক্ষ্মীবাঈ। বলেন, 'মেরি ঝাঁসি দেঙ্গি নেহী'। রণাঙ্গনে তিনি নিজেই সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন। তারপর যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন তিনি। আজ সেই রাজা রানির রাজত্ব নেই, নেই ইংরেজ। কিন্তু ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে ঝাঁসি। বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের একটি জেলা ঝাঁসি। সেখানে এখনও রয়েছে সেই আমলের তৈরি ঝাঁসি দুর্গ। ইতিহাসপ্রেমী পর্যটকরা দূরদূরান্ত থেকে এই ঐতিহাসিক দুর্গ প্রত্যক্ষ করতে আসেন। এছাড়াও ইসকন মন্দির, জৈন মন্দির এখানকার দর্শনীয় স্থান।

এসো সংস্কৃত শিখি

नमो नमः।

নমস্কার।

किमर्थ तावती चिन्ता?

কীজন্য এত চিন্তা?

भवतः किमं कष्टम्?

আপনার কী কষ্ট?

एवं न भवितव्यम् आसीत्।

এরকম হওয়া উচিত ছিল না।

अन्यथा मा चिन्तयतु।

আপনি ভুল বুঝবেন না।

ভালো কথা

দেওয়াল পত্রিকা

ছোট ছোট স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে তৈরি সংস্থার নাম 'ছোট্টবেলা'। এখানকার সদস্যরা সবাই ছোট। কেউ ফোর, কেউ ফাইভ। বড়োরাও আছেন, তাঁরা সবাই উদ্যোক্তা। আমিও সেই সংস্থার সদস্য। গত মার্চ মাসে সবার উদ্যোগে আমাদের একটি দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হলো। নাম 'ছোটদের কথা'। ছোটদের লেখা, কবিতা এবং ছবি সেখানে প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন রঙ দিয়ে আমরা সবাই অনেক ছবি এঁকেছি। কবিতাগুলিও বেশ ভালো। প্রতি ছ'মাস অন্তর এই দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হবে। এই দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষ্যে একটি ছোট অনুষ্ঠানও হয়েছে। সেখানে সবার বাবা-মা এসেছিল। সবাই আমাদের পত্রিকার খুব প্রশংসা করেছে।

রিম্পা আচার্য, সপ্তম শ্রেণী, সিঁথি কলকাতা-৫০

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

নববর্ষ

বিক্রম পাল, অষ্টম শ্রেণী

গাছে গাছে সুবজ পাতা
কালবৈশাখীর ঠাণ্ডা হাওয়া
দুপুরবেলায় আগুন ঝরে
ছাতা মাথায় পথিক চলে।

এমন সময় চারিদিকে
শিবের গাজন বোম্‌ভোলে
পুরনো সব ঝেড়ে ফেলে
নতুন বছর আবার আসে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

বাংলায় সংস্কার ভারতীর ৩০ তম বছরের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

গত ২৯ মার্চ সন্ধ্যায় কলকাতা কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক মিলন সন্ধ্যা। আয়োজক সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত। ৩০ বছর পদার্পণ সমারোহের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের মুখ্য উপদেষ্টা তথা বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা ভিক্টর ব্যানার্জী। স্বনামধন্য অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী ছিলেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। মঞ্চে সংগঠনের সভাপতি তপন গাঙ্গুলী, অন্যতম সহ-সভাপতি গুরু বিশ্বাস, স্বাগত সমিতির

আহ্বায়ক সুভাষ ভট্টাচার্য এবং দক্ষিণবঙ্গের সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায় উপস্থিত ছিলেন। সব্যসাচী চক্রবর্তী সংস্কার ভারতীর উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে আগামী দিনে সঙ্গে থাকার অঙ্গীকার করেন। ভিক্টর ব্যানার্জী সংস্কার ভারতীর নিয়মানুবর্তিতার প্রশংসা করেন এবং তরুণ প্রজন্মের সদস্যদের পরিবেশ সংরক্ষণ করে স্বচ্ছ ভারত গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল অরিন্দম গাঙ্গুলীর কণ্ঠে পেশাদারি নাটকের গান। সহ-শিল্পী ছিলেন সুকণ্ঠী কুমারী কিঙ্কিণী দেব। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী বর্মণের আবৃত্তি, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্প পাঠ এবং তপন গাঙ্গুলী ও খেয়ালি দস্তিদার অভিনীত শ্রুতিনাটক শ্রোতা দর্শককে মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত এবং ক্যালকাটা ফিল্ম অ্যাকাডেমির কর্ণধার অমিত মহাল। উভয়কেই সংস্কার ভারতীর পক্ষ থেকে স্মারক প্রদান পূর্বক সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্মরণিকার আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন সব্যসাচী চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন পর্বে সংস্কার ভারতীর ২৬ জন শিল্পীর সমবেত কণ্ঠে সংস্কার ভারতীর ভাবসঙ্গীত এবং 'ধনধান্য পুষ্প ভরা' সঙ্গীতের কোলাজ বিশেষ প্রশংসিত হয়। সঙ্গীত পরিচালনা করেন বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীমতী রুমা মুখোপাধ্যায়। সুকণ্ঠের অধিকারী ধ্রুবজিৎ ভট্টাচার্যের 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের ভাবগম্ভীর পরিবেশন অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে। অনুষ্ঠানটির সামগ্রিক সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন শ্রীমতী যমুনা পাল ভট্টাচার্য।

পরলোকে নিরঞ্জন হালদার

গত মার্চ মাসে বাসন্তীপূজার দিন নিরঞ্জন হালদার (ছোটদা) ৮১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। ছোটদা একজন তৃতীয়বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষিত স্বয়ংসেবক ছিলেন। বীরভূম জেলার জেলা বৌদ্ধিখ প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেন। জেলার প্রথম সরস্বতী শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য হিসেবে মাত্র ৭ জন শিশুকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে এসে শিশু মন্দিরের কাজের সূচনা করেন প্রয়াত জেলা সঙ্ঘচালক শ্যামল চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়। ছোটদা একজন বৃক্ষপ্রেমী ছিলেন। নিজ হাতে শত শত গাছ শহরের বিভিন্ন স্থানে রোপণ ও জল সিঞ্চন করতেন। অকৃতদার ছোটদা একজন মানবদরদি, সেবাব্রতী ও শিশুপ্রেমী ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে 'শ্রদ্ধা' নামক এক প্রতিষ্ঠান সিউড়ি শহরে ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত সহস্র চন্দ্র দর্শনকারী ৮৫ জন বয়স্ককে 'শ্রদ্ধা' নিবেদন ছোটদা নিজ হাতে সম্পন্ন করেছেন।

সিউড়ি শহরের যে শিশু মন্দিরগুলি চলে, তার তিনি অভিভাবক স্বরূপ উপদেষ্টামণ্ডলীতে ছিলেন। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পরিচালিত প্রণবানন্দ আদর্শ পাঠ মন্দিরে শিক্ষকতা করতেন। ছোটবেলা পূর্ববঙ্গ থেকে এসে বালিগঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ের ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশুনা করেন। সঙ্ঘের সভাপতি পরম পূজ্যপাদ শচীদানন্দ মহারাজের কাছে অমৃতদীক্ষা লাভ করেন। সেখান থেকে ষাটের দশকে তাঁর সিউড়ি আগমন ও সঙ্ঘ কাজে ব্রতী হওয়া। বিবেকানন্দ শিলা স্মারকের অর্থ সংগ্রহ, রামশীলা পূজা, একাত্মতা যজ্ঞ, প্রথম কল্যাণী মহাশিবির (১৯৯২) সব কাজে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রয়াত প্রচারক নারায়ণ পাল তাঁর সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। একজন দেশপ্রেমী, সেবাব্রতী, সঙ্ঘপ্রেমী উদার মানসিকতা সম্পন্ন বন্ধু বৎসল হৃদয়বান স্বয়ংসেবকের প্রয়াণে সমগ্র সিউড়িবাসী দুঃখিত, ব্যথিত ও মর্মাহত। সিউড়িবাসী তাঁর মহাপ্রয়াণযাত্রায় বিভিন্ন স্থানে সমবেত হন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁর বিদেহী আত্মার সদ্গতি ও চিরশান্তি লাভ করুক পরম মঙ্গলময়ের কাছে এই প্রার্থনা।

শ্রদ্ধা'র ৮৪ তম বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ১২ মার্চ শুভ দোলপূর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় বীরভূম জেলার কড়িধ্যা নিবাসী ৯২ বছর বয়স্ক শ্রদ্ধেয় রাধাবিনোদ চন্দ্র শর্মাকে তাঁর ভদ্রাসনে শ্রদ্ধার পক্ষে ৮৪তম বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়।

এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন 'শ্রদ্ধা'র প্রবীণ অনুভবী নির্মল দত্ত। শ্রী শর্মার হস্তপদ ধুইয়ে চন্দন, ফুল, তুলসীপত্র দ্বারা পূজন করেন তাঁর মেজ বৌমা শ্রীমতী মালতী শর্মা।

শ্রী শর্মাকে শ্রদ্ধার পক্ষ থেকে গীতা, পরিধেয় বস্ত্র, নামাবলী, ফল ও মিষ্টান্ন অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করা হয়। বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও পরিবারের পক্ষে পরিবারের মেজ পুত্র কেদারনাথ শর্মা। আরতি করেন ছোট বৌমা শম্পা শর্মা। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সিউড়ি বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য।

উত্তরবঙ্গ সংস্কার ভারতীর প্রান্ত বৈঠক

সংস্কার ভারতী উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রবন্ধকারিণী বৈঠক ২৫ ও ২৬ মার্চ মালদহ শহরের শ্যামাপ্রসাদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে জিয়াগঞ্জ, মালদহ, গাজোল, চাঁচল কলিগ্রাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি, কোচবিহার, কার্সিয়াং থেকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে কোচবিহারের শেষ চা বাগান অঞ্চলের বোখনাবান্ধা থেকে ভাওয়াইয়া শিল্পী গোপাল ব্রহ্মচারী তার দলবল নিয়ে এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক তড়িৎ মিশ্র, গোপাল ব্রহ্মচারীর সহধর্মিণী শ্রীমতী সন্ধ্যা ব্রহ্মচারীর বিশেষ করে পরিচয় করিয়ে দেন। সন্ধ্যা ব্রহ্মচারী সম্প্রতি ভাওয়াইয়াগানে নির্মল ভারতের প্রচারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপালের দেওয়া বিশেষ পদক ও পুরস্কার পান।

এই বৈঠকে পূর্ণ সময়ে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় সহ-সম্পাদক বালাকৃষ্ণমূর্তিজী এবং ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক নিরঞ্জন পণ্ডা। বৈঠকে ঠিক হয় পরবর্তী প্রান্ত বৈঠক ২৪ ও ২৫ জুন কোচবিহারে হবে এবং এ বছরের শিল্পী সম্মেলন ২৭, ২৮ ও ২৯ অক্টোবর কার্শিয়াংয়ে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রান্ত সম্পাদক বিকাশ ভৌমিক মহাশয়।

বর্ধমান জেলার কুটুম্ব প্রবোধনের কার্যক্রম

গত ২৬ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত বর্ধমান জেলার বিভিন্ন গ্রামে কুটুম্ব প্রবোধনের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রত্যেকটি কার্যক্রমে দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র উপস্থিত থেকে বক্তব্যের মাধ্যমে সকলকে উৎসাহিত করেন। কাটোয়াতে একটি পরিবারেই ২৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন এবং একসঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন করেন। এছাড়া পূর্বস্থলীর মেড়তলা অঞ্চলের কাসারডাঙা গ্রামে ২৬ জন, সমুদ্রগণের নিমতলা গ্রামে ১৯ জন এবং পাটুলির বিবিতলায় ৩৬ জন মহিলা পুরুষ-সহ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন প্রান্তটোলির সদস্য বিনয়ভূষণ দাস।

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা দক্ষিণপূর্ব ভাগের কুটুম্বপ্রবোধন প্রমুখ সুভাশিস বসুমল্লিক তাঁর পুত্র সৌগতর শুভ বিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দীর হাতে। শ্রী নন্দী সেই রাশি সমাজ সেবাভারতী পরিচালিত কর্ণমাধবপুর প্রকল্পের জন্য প্রদান করেন।

নৈহাটিতে আরোগ্য ভারতীর চিকিৎসা শিবির

গত ২ এপ্রিল নৈহাটির শ্যামনগরের রত্নেশ্বর ঘাটে ন্যাশনাল আয়ুর্বেদিক স্টুডেন্ট অ্যান্ড ইউথ অ্যাসোসিয়েশন, আরোগ্য ভারতী এবং গাড়ুলিয়া নগর রামনবমী উদযাপন কমিটির যৌথ উদ্যোগে একটি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিবির আয়োজিত হয়। শিবিরে ৬০০

জন শিশু, মহিলা, বয়স্ক, কিশোর স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন। শিবিরে ডাবর এবং নেনোরা কোম্পানির পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল আয়ুর্বেদিক স্টুডেন্ট অ্যান্ড ইউথ অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ সুশোভন পাল। এবিভিপির রাজ্য সম্পাদিকা ডাঃ নূপুর বিশ্বাস। এলাকার তরুণ সমাজকর্মী জিষ্ণু প্রসাদ সেন। এছাড়াও বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৈদ্য রত্নাকর বাচস্পতি ডাঃ শৈলেন্দ্র সিং, ডাঃ সঞ্জয় টিকাদার ও ডাঃ দেবাংশু অগ্রহরি।

কলকাতায় রক্তদান শিবির

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা দক্ষিণ-পশ্চিমভাগের উদ্যোগে শিবাজী ও ডাক্তারজীর জন্মদিবস উপলক্ষে গত ১৯ মার্চ কলকাতার একলব্য ভবনে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। কলকাতা মহানগরের সেবা প্রমুখ রাজীব শরণ, তিনজন সঙ্ঘচালক— সাধু সিং জৈন, রামানন্দ রাস্তোগী ও কেশব গুপ্তা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। ১০০ জন রক্তদান করেন। শিবির পরিচালনা করেন সুশীল বাগাড়িয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ললিত টোডি, অনিল জৈন, অভিষেক সিংজী, অপুন সিং, সজ্জন বনশল প্রমুখ।

লোকপ্রিয় প্রসাদ চক্রবর্তীর ১০৩তম জন্মজয়ন্তী পালন

শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউট অব্ কালচার, তাজপুর, হাওড়ার উদ্যোগে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ, জাতীয় ঐক্য সংহতির প্রতীক, পল্লীবাংলার রূপকার, আদর্শ গ্রাম গঠনের ঋত্বিক, সমাজসেবার ভগীরথ, লোকপ্রিয় প্রসাদ চক্রবর্তীর ১০৩তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয় গত ৮ এপ্রিল। প্রভাতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা-সহ গ্রাম প্রদক্ষিণের পর প্রসাদতীর্থ সভাগৃহের জনাকীর্ণ সমাবেশে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রসাদ চক্রবর্তী, স্বামী বিবেকানন্দ ও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মর্মর মূর্তিতে মাল্যার্পণের পর প্রসাদবাবুর জীবনী আলোচনা করেন সনৎ পাল, প্রশান্ত ভৌমিক, নন্দলাল মণ্ডল ও তপন রীত প্রমুখ ব্যক্তি। সকল বক্তাই তাদের বক্তব্যে প্রসাদবাবুকে আজকের নীতি ও আদর্শহীনতার আবহে সকলের বিশেষত যুবসমাজের অনুকরণীয় চরিত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। পরে প্রসাদস্মৃতি সরস্বতী শিশু মন্দিরের ছাত্রছাত্রীরা বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বিকাল ৩ ঘটিকায় শিশু মন্দিরের ছাত্রছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ক্যুইজ, নৃত্য, গীত, গীতিনাট্য ও নাটক পরিবেশন করে। পরিশেষে গত বাৎসরিক পরীক্ষায় শীর্ষ স্থানাধিকারী শিশু মন্দিরের ছাত্রছাত্রী ও বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সফল ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার অছিপরিষদ সদস্য দিলীপ চক্রবর্তী।

মায়াপুর ইসকন মন্দিরে বনবাসী সম্মেলন

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘ (ইসকন)-এর প্রধান শাখা শ্রীধাম মায়াপুরে গত ৯ থেকে ১১ এপ্রিল তিনদিন ব্যাপী বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের সমাগমে 'ইসকন ট্রাইবাল কনভেনশন' অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় রেল রাজ্য প্রতিমন্ত্রী রাজেন গোহাইন, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জেমস্ কুজুর। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক উজ্জ্বল বিশ্বাস, ভারতরত্ন প্রাপ্ত শিক্ষক বিমলেন্দু সিংহ রায়, শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম এবং ইসকনের অন্যতম গুরু ও সর্বোচ্চ পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ এবং ট্রাইবাল কনভেনশনের নির্দেশক শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। আই টি সি আই বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি বিনিময়, সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব, ভালোবাসার পরিস্ফুটন, জীবনাদর্শের প্রতি যত্নশীলতার মনোভাব গড়ে তোলার জন্য মূলত মুখ্য পাঁচটি বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছেন। যথা— শারীরিক সচেতনতা, মানসিক সচেতনতা, সামাজিক বিকাশ, শিক্ষা সচেতনতা ও আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিশেষ করে ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশ থেকে এবছর ১০০০ জন জনজাতি এই বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। প্রায় ২০টি ভিন্ন ধরনের জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব ছিল। ট্রাইবাল কনভেনশনের মুখ্য আকর্ষণীয় বিষয় ছিল উপজাতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কারুশিল্প প্রদর্শনী। এছাড়া ছিল গঙ্গাপূজা, গো-পূজা ও গীতা পারায়ণ। অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন দেশ-বিদেশের ভক্তবৃন্দের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অনাবিল ভালোবাসা ও মেলবন্ধনের নজির হয়ে রইল।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের ব্যবস্থা প্রমুখ রঘুনাথ কেডিয়ার সহধর্মিণী তারাদেবী কেডিয়া গত ২০ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি স্বামী, ৩ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর তিন পুত্রই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক।

* * *

কলকাতা মহানগরের বিধাননগর করুণাময়ী শাখার মুখ্য শিক্ষক দেবাশিস মিত্রের মাতৃদেবী কমলা মিত্র গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ৮৬ বছর বয়সে এবং তাঁর পিতৃদেব অমলকুমার মিত্র গত ৩১ মার্চ ৯২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

* * *

মালদা সঙ্ঘ কাজের অন্যতম স্থপতি ছিলেন নলিনী রঞ্জন ভৌমিক। তিনি সংসারী হয়েও প্রচারকের মতো সঙ্ঘকাজ করে গেছেন আজীবন। তাঁর নামে মালদা বিজেপি কার্যালয়ে একটি বড় কক্ষের নামকরণ করা হয়েছে। তাঁরই সহধর্মিণী মুকুল ভৌমিক গত ২৬ মার্চ পরলোকগমন করেন। মুকুল ভৌমিক নেতাজী সুভাষ রোডের সরস্বতী শিশু মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল (১৯৯২) থেকেই আচার্যা পদে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়াও রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির বৌদ্ধিক প্রমুখের দায়িত্ব দীর্ঘদিন পালন করেন। কিছুদিন ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চার সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি রেখে গেছেন এক কন্যা, জামাতা ও এক দৌহিত্র।

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদা বিভাগ সম্পর্ক প্রমুখ নির্মল কুমার নাথের পৌত্র তথা মালদা জেলার নালাগোলা খণ্ডের সহ-খণ্ডকার্যবাহ কৌশিক কুমার নাথের পুত্র কর্ণিকের শুভ অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে ঠাকুরদা নির্মল নাথ মঙ্গলনিধি প্রদান করেন নালাগোলো খণ্ড কার্যবাহ রতন রায়ের হাতে। অনুষ্ঠানে মালদা বিভাগ কার্যবাহ রামেশ্বর পাল-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
24 April - 2017 - Rs. 10.00,

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা ।।